পুনর্যাত্রা

সমরেশ বসু

পুনর্যাত্রা



অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ : শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ

শ্রীদ্বিজদাস কর কর্তৃক ত ণিমা প্রকাশনী ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-
৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীঅজিত পাল কর্তৃক দ্‌গা প্রিণ্টার্স
১০/১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে ম্‌দ্রিত।

'একস্‌পেলড !'

অলক এই শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। বাকি ছ'জন হাত তুলেছিল। সাতজন একদিকে। প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে বসেছিল। কয়েক হাত দূরে সকলের মুখোমুখি তাপস। ও চমকায়নি, অবাক হয়নি। চোখের সামনে একটা হাতে তৈরি কাগজের অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পান্ডুলিপি ভাসছিল। কিন্তু অন্য-মনস্ক ছিল না। ছোট ঘর। দরজা জানালা সব বন্ধ। সিমেন্টের সাধারণ মেঝের ওপর একটা মাদুরের ওপর সবাই বসেছিল। মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। সাতজনের ছায়া দেওয়ালের একদিকে। বড় বড় ছায়ায়, ওদের পিছনটা অন্ধকার হয়েছিল। মুখোমুখি তাপসের ছায়াটা বিপরীত দিকে। বন্ধ ঘর। গরমে সবাই কম বেশি ঘামছিল।

অঞ্চল, পূর্ব চব্বিশ পরগণার মহকুমা শহরের এক প্রান্ত। ইস্কুল মাস্টার মহিমদার বাড়ি। মহিম নস্কর। পার্টির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। বউদিও। বউদিও একটি প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষিকা। ইঁটের দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে, মাথায় টালি। বাড়ির চারপাশে ফণিমনসার বেড়া। একটা ঝাড়ালো আম গাছ। বছর খানেক বয়সের কিছু নারকেল সুপুরির চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সীমানার এদিকে ওদিকে। লাউ কুমড়োর মাচা। টালির চালে ধুঁধুলের লতানো ঝাড়। আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো এরকমই আরও কয়েকটি বাড়ি। গরীব শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের নতুন পাড়া। সকলেই আনে, নেয়, খায়, কোনো ঝামেলায় থাকে না। অতএব, এ পাড়ার দিকে কারোরই তেমন নজর নেই। পুলিশেরও না। মহিমদার সঙ্গে অতীতে কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ ছিল না। শান্তিপ্রিয় সাধারণ ইস্কুল মাস্টার ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় নেই। অথচ তাঁর বড় ছেলে মানিকের রাজনীতির একজন সমর্থক হয়ে উঠেছেন। মানিক বাংলায় অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে। এম এ পড়তে গিয়েই এই গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ। লেখাপড়ার সেইখানেই ইতি। কারণ, এ লেখাপড়া তার দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে মূল্যহীন। মহিমদা আপত্তি করেননি। বরং ছেলের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এই মধ্যবয়সে তাই তিনি ছেলের একজন সমর্থক। বউদিও। ছেলেকে নিয়ে তাঁদের একটা গর্বও আছে। তাঁরা দলের সদস্য নন। কিন্তু অনিবার্য ভাবেই দলের সমর্থক। বর্তমানের এই পচা ধসা বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁদেরও তীব্র বিদ্বেষ। কিন্তু চাকরি চালিয়ে যেতেই হচ্ছে। মহিমদাকে তাঁর নিজের মতোই থাকতে হবে। তা না হলে এ গোপন আশ্রয়টা ভেঙে যাবে।

অতএব, গোপন যোগাযোগ, আর প্রয়োজনে পার্টিমিটিং-এর পক্ষে এ-বাড়ি

সব থেকে নিরাপদ। আদর্শ জায়গা। বিশেষ করে, এই দুঃসময়ে। পার্টি যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেন্ট্রাল কমিটির সঙ্গে জেলা কমিটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জেলা কমিটিগুলোর সঙ্গে অধিকাংশ লোকাল ইউনিটগুলিও বিচ্ছিন্ন। যেমন এই ইউনিট। এখানকার ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগকারী দুজন কুরিয়র-এর মধ্যে একজন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছে। আর একজন নিখোঁজ। নেতারা এবং অনেক সদস্য ধরা পড়েছে। কোনো কোনো নেতা আর অসংখ্য কমরেড খুন হয়েছে। কেন্দ্রের বিভিন্ন গুপ্তচর সংস্থা আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে গোটা দেশটা যেন একটা উকুন ভরতি ঘন ঠাসা চুলের মাথা। সেই মাথার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিরুনি চালিয়ে চলেছে। ধরা পড়লেই টিপে মারা। কোথাও কোথাও এনকাউন্টারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পার্টি হেরে যাচ্ছে। মূল সংগঠন বলতে কিছু নেই। সব তছনছ হয়ে ভেঙে পড়েছে। যোগা-যোগ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন। বন্ধুর ছদ্মবেশে গুপ্তচরদের চেনা যায় না। অতএব, নতুন কোনো মেমবারশিপের প্রশ্ন নেই। ভাঙাচোরা সেলগুলো এখন এক একটা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ মাত্র। পার্টির শেষ নির্দেশ ছিল, মৌল নীতি অনুযায়ী, গ্রুপগুলো একত্রে বসে যখন যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা-ই কার্যকরী করবে। এখন থেকে গ্রুপ-গুলোই একটা পূর্ণ ইউনিটের এবং পার্টির ভূমিকা নেবে।

গ্রুপের নেতা নির্বাচনের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও আপাততঃ এ গ্রুপের নেতা অলক। গায়ের জোরে না। অলকের নেতৃত্ব সবাই মেনে নিয়েছে। মানিক, মনীষা আর রুকনুদ্দিন ছাড়া কেউ স্থানীয় নয়। সকলেই কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের। কিন্তু এই অঞ্চলের বিভিন্ন গোপন আশ্রয়ে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যোগাযোগ রাখে, মিটিং করে, সিদ্ধান্ত নেয়। প্রয়োজনে কারোকে অঞ্চলের বাইরে যেতে হলে গ্রুপের সম্মতি নিতে হয়।

বাইরে থেকে বাড়িটির চেহারা একটি নিরীহ গৃহস্থের। এবং বস্তুত তা-ই। রাত্রি মাত্র আটটা। মহিমদা বাইরের বাঁধানো রকে দুই ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছেন। বউদি রান্না করছেন। ভিতরে দুটি ঘরের একটিতে মিটিং চলছিল। মহিমদার পড়ানো, বউদির রান্না, পড়ুয়া ভাইবোনের পড়া, এখন সবটাই ছলনা। সকলেই চারদিকে পাহারা দিচ্ছে, নজর রাখছে।

আজকের মিটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তেজনা তীব্র। এ্যাজেন্ডা মাত্র একটা। পার্টির নির্দেশ অমান্য করার বিচার। নির্দেশ অমান্য করেছে তাপস। অতএব ও একলা একদিকে সকলের মুখোমুখি। বাকিরা সবাই বিপরীত দিকে, প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকারে ওর মুখোমুখি। আলোচনা করার কিছু ছিল না। পার্টির নির্ধারিত নীতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাও অপ্রয়োজনীয়। কেবল কিছু জিজ্ঞাসাবাদ। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না। জিজ্ঞাসা একটি।

তাপস এসেছিল সকলের পরে। ইচ্ছা করেই এসেছিল। জানতো, আজকের গ্রুপ মীট করার একমাত্র লক্ষ ও। সকলের শেষে আসার উদ্দেশ্য ছিল, গ্রুপ যদি ওর সম্পর্কে আগে কিছু কথাবার্তা নিজেদের মধ্যে বলে নিতে চায়, সেই সময়

দেওয়া। কিন্তু ও ঘরে ঢুকে দেখেছিল, সবাই চুপচাপ একদিকে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছিল না। সকলেরই চোখ ছিল দরজার দিকে। তাপস ঢুকেছিল। মহিমদা বাইরে থেকে দরজার শিকলটা টেনে দিয়েছিলেন। আজকের জন্য এটা কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না। গ্রুপ মীট করতে বসলেই দরজার শিকল টেনে দেওয়া হয়। মিটিং শেষে দরজায় টোকা দিলেই শিকল খুলে দেওয়া হয়। পিছন দিকেও একটা দরজা আছে। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

তাপসের কাঁধে সাইড ব্যাগ। ঘরে ঢুকে দেখেছিল, ওর ওপর সকলের চোখ। তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি সকলের চোখে। সাতটি শক্ত মুখ। গ্রুপ মিটিং-এর এই প্রথম নতুন চেহারা। তাপস মাদুরের ওপর পা দিয়েই বুঝেছিল, আজ ওর সকলের পাশে বসার দিন না। ও মুখোমুখি বসেছিল। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখেছিল। গম্ভীর মুখে সকলের দিকেই নির্বিকার চোখে দেখেছিল। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয়ের কোনো চিহ্ন ছিল না ওর মুখে। যে-কোনো চরম ব্যবস্থার জন্য ও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। অলক প্রথম মুখ খুলেছিল। ওর মাথায় অনেকদিনের আকাটা চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। যথাসম্ভব নিচু স্বরে কথা বলা নিয়ম। অলক নিচু তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছিল, 'ওয়াইপারটা'।

তাপস ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়েছিল। বের করেছিল কোল্ট পয়েন্ট থ্রি এইটটা। গ্রুপের সব থেকে দামী অস্ত্র। হাত বাড়িয়ে অলকের সামনে মাদুরের ওপর রেখেছিল। অলকের পাশে কল্যাণ। ওরও মাথার চুল বড়। ভরাট মুখে একজোড়া চৈনিক গোঁফ। কল্যাণ রিভলবারটা নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল। আনলক করে দেখে নিয়েছিল, বুলেট লোড করা আছে। সব বুলেটগুলোই ছিল। তাপস ব্যাগের ভিতর থেকে টিফিন বকস-এর মতো একটা স্টিলের বকসও এগিয়ে দিয়েছিল। ওয়াইপার—অর্থাৎ, রিভলবারটা প্রথম চেয়ে নেওয়ার অর্থই হলো তাপসের কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নেওয়া। বকসটার মধ্যে কিছু আলাদা বুলেট ছিল। কল্যাণ বকস্‌টার ঢাকনা খুলে দেখে নিয়েছিল। রিভলবারের পাশে বক্‌সটা রেখেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী পার্টির সমস্ত গোপন দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। অতএব, তাপসের কাছে আর কিছুই ছিল না।

কল্যাণের পাশে মনীষা বসেছিল। (মনীষা এখন ওর বন্ধুদের সংগে শহরের বুকে সিনেমা হলে ইভনিং শো দেখছে। বাড়িতে ওর মা তা-ই জানেন। ওর বাবা এ শহরের সব থেকে বড় আর ব্যস্ত ডাক্তার। তিনি এখন তাঁর চেম্বারে।) মনীষার পাশে মানিক। গ্রুপের সব থেকে কমবয়সী ছেলে। মুখে কাঁচ দুর্বাঘাসের মতো পাতলা গোঁফদাড়ি গজিয়েছে। মানিকের পাশে পশুপতি। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ। মাঝারি লম্বা চুল। পশুপতির পাশে রুকুন। পুরো নাম রুক-নুন্দিন। ওর মাথায়ও লম্বা চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। রুকুনের পাশে অজয়। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। মাথার চুল ছোট করে কাটা। বয়স সকলের একুশ থেকে ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে।

কারোর গায়ে ময়লা আধ ময়লা ট্রাউজার শার্ট। কারোর পায়জামা পাঞ্জাবী।

মনীষা অবশ্যিই শাড়ি আর জামা পড়েছিল। সিনেমা দেখতে যেতে হলে যতোটা সাজগোজ করা উচিত, করেছিল। বাসন্তী রঙের লালপাড় শাড়ি, লাল জামা। মাথায় এক বেণী করা ছিল। বাঁ হাতে ঘড়ি। কোনো অলংকার বা প্রসাধনের চিহ্ন ছিল না। এমনিতেও থাকতো না। একমাত্র তাপসের পোশাক আধময়লা ধুতির ওপরে, কয়েকদিনের ব্যবহৃত গেরুয়া পাঞ্জাবী। মাথার চুল খুব বড় নয়। গোঁফ দাড়ি ছোট করে ছাঁটা।

অলক আর কল্যাণ কলকাতা থেকে এসেছে। পশুপতি বরানগর থেকে। অজয় ইছাপুর। তাপস কলকাতা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের হলেও আসলে কলকাতা থেকেই এখানে এসেছিল। কল্যাণ, অলক ও আর মনোজ একসঙ্গে এক কলেজে পড়েছিল। এক সঙ্গেই কলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করেছিল। বিষয় ছিল ইংরেজি। তারপরেও তাপস সংস্কৃত নিয়ে পড়া শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ করে বেদ উপনিষদ ও পুরাণ থেকে ভারতীয় ইতিহাস চর্চা। সেই সঙ্গে অবিশ্যিই সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্য। সময়টা উনসত্তর সালের শুরু। সেই সময়েই মনোজের কাছে রাজনীতির দীক্ষা।

মনোজ কলেজে থাকতেই ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিল। তারপরে এই পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ। মনোজ এ অঞ্চলের ছেলে। জেলা কমিটি থেকে ভারপ্রাপ্ত, এ অঞ্চলে পার্টির প্রথম সংগঠক এবং নেতা। অলক, কল্যাণ আর তাপসকে ও-ই এ অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল। পশুপতি আর অজয় এসেছিল ওদের লোকাল পার্টির নির্দেশে। আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল আশেপাশের গ্রামে। মনোজের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামগুলোর কৃষকদের মধ্যে একটা ছোটখাটো মিলিট্যাণ্ট গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। তাপসরা সবাই গ্রামেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে শহরে আসতে হতো। কলকাতা এবং জেলার অন্যান্য অঞ্চলের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আর নির্দেশের জন্য। যোগাযোগের জায়গা ছিল দুটো। মহিমদার এই বাড়ি আর মনীষাদের বাড়ি। মনোজের বোন দীপা আর মনীষা স্থানীয় কলেজে পড়তো। মনীষাকে পার্টিতে এনেছিল দীপা।

তাপস এখানে আসার আগেই শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরের একটি পুলিশ আউটপোস্ট আক্রমণ করে, দুটি বন্দুক সংগ্রহ হয়েছিল। মারা গিয়েছিল একজন সেপাই। বাকিরা বোমায় আহত। জমাদার পালাতে পেরেছিল। এ অঞ্চলে সেই প্রথম সাড়া। পাইপ গান ছিল তিনটি। কোল্ট পয়েন্ট থ্রি এইট এসেছিল তাপস আসার পরে। ছুরি বল্লম, দা' কাটারি ছিল গ্রামের নিজস্ব সংগ্রহ। লোকাল ইউনিটের আওতায় নদীর এপার ওপার মিলিয়ে প্রায় এক ডজন গ্রাম ছিল। প্রথম জোতদার খতম করা হয় নদীর ওপারে। মনোজই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ওপারে খতম করে এপারে এসে গা ঢাকা দেওয়া। এ অঞ্চলে সেই প্রথম জোতদার নিধন। জোতদার বা মহাজন খতমের মাধ্যমে জনজমায়েত, লক্ষ ছিল এটাই। প্রথম খতমে জনজমায়েত হয়নি, কিন্তু প্রবল সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মনোজের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছিল। পুলিশ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নদীর ওপারে।

তাদের একটা সন্দেহ হয়েছিল, নদীর ওপারেই এ্যাকশন করে দলের লোকেরা ভারতের সীমানা পেরিয়ে পাশের দেশে গিয়ে আত্মগোপন করছে। কিন্তু গুপ্তচরের দল ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। এপারে, ওপারে। শহরের মধ্যে, এ পারের গ্রামে ও গঞ্জে।

জনজমায়েত না হলেও 'খতমের প্রথম ফলশ্রুতি, পুলিশ আব গুপ্তচরদের আবির্ভাব ঘটেছিল অনিবার্যভাবেই। গ্রামে অচেনা মুখ দেখলেই বুঝতে হবে গুপ্তচর। লক্ষ রাখার বিষয় ছিল, গ্রামের কারা শহরে, কোথায় যায়। কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গুপ্তচর গ্রামের মধ্যেও ছিল। ওপারেব জোতদার খতমের দু সপ্তাহ পরে এপারের গ্রামে একজন কুখ্যাত সুদখোর মহাজনকে খতম করা হয়েছিল। ইউনিট সরে এসেছিল শহরের আশেপাশে। জনজমায়েত হয়নি। কিন্তু একটা প্রবল আলোড়ন আর উৎসাহের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বিরাট এলাকা জুড়ে। সেই সঙ্গে অবিশ্যিই দ্বিধা এবং ত্রাস। গ্রামে ও শহরে, দু জায়গাতেই।

শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়েছিল। শাদা কাগজে লাল টকটকে অক্ষরের পোস্টার। আগুনের শিখা। 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন।'...'জনশত্রুদের খতমে এগিয়ে আসুন।'...'চীনের চ্যায়ারম্যান আমাদেব চ্যায়ারম্যান।'...

নদীটা অনেকখানি সহায় হয়েছিল। এপারে কাজ সেরে, ওপারে পালিয়ে যাওয়া। ওপারে কাজ সেরে এপারে পালিয়ে আসা। একাত্তরের শেষাশেষি পর্যন্ত টোটাল তিনজন জোতদার একজন মহাজন একজন সেপাই খতম হয়েছিল। ওপারের দ্বিতীয় জোতদার খতমের খণ্ডযুদ্ধের প্রথম শহীদ মনোজ আর বকুনের বাবা আবদুল। পুলিশ তখনই সমস্ত গ্রামগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ কৃষকদের ওপর শুরু হয়েছিল অত্যাচার। মিলিট্যান্ট গ্রুপের পাঁচজন পুলিশের হাতে খুন হয়েছিল। তার মধ্যে জগত মাহাতো। যার নেতৃত্বে তৃতীয় জোতদার খতম হয়েছিল। জগতের বউকে কতোজন পুলিশ ধর্ষণ করেছিল, হিসাব ছিল না। তারপরে খুন। তখনই খবর এসেছিল, একজন কুরিয়র ধরা পড়ে খুন হয়েছে। সেই প্রথম জেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার শুরু। এবারের (বাহাত্তরের) নির্বাচনের মুখে, আর একজন কুরিয়র নিখোঁজ। ধরে নেওয়া হয়েছে, সেও ধরা পড়েছে। মনীষাদের বাড়ি আর মহিমদার বাড়ি, কিছুকাল যাওয়া আসা একেবারে বন্ধ রাখা হয়েছিল।

খতমের মাধ্যমে জনজমায়েত সার্থক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার ফলশ্রুতি, পুলিশ ও দালালদের আবির্ভাব হয়েছিল। হলেও, তাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল পুরোপুরি গড়ে ওঠবার আগেই গ্রামে গ্রামে উলটো বাতাস বইতে আরম্ভ করেছিল। জনজমায়েতে শাসক শ্রেণীর আগমন ঘটলেই থার্ড স্টেপ। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে গেরিলা যুদ্ধ। স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল সৃষ্টি।

শ্রেণী শত্রু বলতে যাদের প্রথমে বেছে নেওয়া হয়েছিল, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করা গিয়েছিল। শহরের সমর্থনেব প্রতি আদৌ আস্থা রাখা

যায়নি। অথচ গ্রামগুলোকে যথাযথ সংগঠিত করে তোলা যায়নি। কেন্দ্র এবং সর্বস্তরের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, দালাল বাহিনী, আর সব থেকে মারাত্মক ছদ্মবেশী গুপ্তচরদল চারদিক থেকে ঘিরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তাপসের প্রথম ধারণা : মূল নীতি হিসাবে যা ভাবা হয়েছিল, খতমের সূত্র ধরে গ্রামের গরীব ভূমিহীন কৃষকরাই নেতৃত্ব নিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়বে, কার্যতঃ তা হয়নি। সম্ভবতঃ এর একটা উলটো মনস্তাত্ত্বিক দিক ছিল। নেতৃত্ব দেবে শহরের কমরেডরাই, তাদের সাহসই কৃষকদের প্রাণে সঞ্চারিত হবে এবং তারা লড়বে। শত্রুর বিশাল শক্তির কথা ভেবে চিরকাল বসে থাকা যায় না। ঠিক কথা। কিন্তু নিজেদের শক্তি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত ছিল। নিজেদের শক্তি, এই অর্থে, কিছু অস্ত্র না। আসলে গ্রামের সংগ্রামী কৃষক বাহিনী। যেহেতু কৃষকদের মধ্যে, শত্রুর প্রতি ঘৃণা ক্রোধ বর্তমান। সেই হেতুই তারা, একটা সুযোগ ও সংকেত পেলেই লড়াইয়ে নেমে পড়বে, বাস্তবে তা ঘটে না। এ ক্ষেত্রে দাহ্য পদার্থ থাকলেই জ্বলে উঠবে, এরকম নিশ্চিত হওয়াটাও দেখা গেল অবৈজ্ঞানিক। যার অনিবার্য ফল, গ্রামের লোকেরা ক্রমাগত পুলিশের হাতে মার খেয়ে তাপসদের তাড়া করলো। গ্রাম ছাড়া করলো। তাপসরা ছড়িয়ে পড়লো শহরের মধ্যে।

এই অবস্থার মধ্যেও পার্টির শেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লোকাল ইউনিট গ্রুপ হিসাবে কাজ করে যেতে লাগলো। তাপসের মনের প্রশ্নগুলো মনেই থাকলো। পরিস্থিতি আলোচনা করার মতো মনের অবস্থা কারোরই ছিল না। বরং পুলিশের অত্যাচারে, বহু কমরেডের খুনের বদলা নেবার জন্য খতম অভিযান চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত বহাল রইলো। আর এই সময় থেকেই ইণ্ডিভিজুয়াল এ্যাকশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। খতম করবে একজন। বাকিরা চারপাশে লুকিয়ে থাকবে। অবস্থা বুঝলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাকে খতম করা হবে, গ্রুপের বৈঠকে আগেই তা ঠিক করে নেওয়া হতো।

এই পরবর্তী অভিযানে প্রথম খতম করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল, বারো মাইল দূরের এক বি ডি ও-কে। দায়িত্ব ছিল কল্যাণের। বাকিরা কাছেপিঠে ছড়িয়েছিল। কিন্তু ভুলক্রমে মারা পড়েছিল বি ডি ও অফিসের একজন সাধারণ কেরানী। দু সপ্তাহ পরে কলকাতা থেকে এ শহরে ফেরার পথে এই রুটের একজন প্রাইভেট বাসের মালিককে খতম করে তাপস। বৈঠকে এই খতমের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করবে ভেবেও করতে পারেনি। লোকটির একটি বাস ছিল। খতম করা হয়েছিল শহরের বাইরে, বাস থেকে নামিয়ে। তাপস নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেরেছিল। কিন্তু গ্রুপকে সে-কথা বলেনি। পরবর্তী বৈঠকে ও এস ডি ও-কে খতমের প্রস্তাব তুলেছিল। প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। অলকের বক্তব্য ছিল, এস ডি ও-কে মারলে এ-শহর থেকে চিরদিনের জন্য সরে যেতে হবে। এবং পরিস্থিতিও অনুকূল ছিল না। সবাই অলককে সমর্থন করেছিল। পরিবর্তে বেছে নেওয়া হলো একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে। ডাক্তারটি নতুন

এসে বসেছিল শহরের বড় রাস্তার ওপর একটি দোকান ঘরের স্বত্ব কিনে। সন্দেহ করা হয়েছিল, সে গুপ্তচর। সেরকম একটা খবরও ছিল। অলক তাকে খতম করে। পরে অবিশ্যি জানা যায়, লোকটির বাড়ি ছিল সাত মাইল দূরে। কলকাতার জি পি ও-র একজন রিটায়ার্ড কর্মচারি। তাপস পার্টির মূল নীতি নিয়ে আলোচনা তুলেছিল। স্পষ্টই বলেছিল, ভুল ব্যক্তিদের খতম করা হচ্ছে। বলেছিল, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আবার গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করার সুযোগ নেওয়া উচিত।

অলক প্রতিকূল পরিবেশের কথা তুলে আপত্তি করেছিল। খতমের বিষয়ে তাপসের কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। দু একটা ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু খতমের নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া কোনোরকমেই চলবে না। কেন না, সেটাই পার্টির নির্দেশ। শত্রুকে এভাবেই ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণের ভয়ে অস্থির করে রাখতে হবে। জনসাধারণের কাছে পার্টির অস্তিত্বকে এ ভাবেই প্রমাণ করে যেতে হবে। এবং মনোবলকে জীইয়ে রাখতে হবে।

গ্রুপ অলককে সমর্থন করেছিল। তারপরই কোর্টের একজন হাবিলদারকে খতমের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। লোকটি শহরের অন্য এক প্রান্তের অধিবাসী। ছাপোষা গৃহস্থ। মাইনের সঙ্গে নিয়মমাফিক পাওনা-দস্তুরি বা কিছু ঘুষ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। খতমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাপসকে। তাপস ওর দ্বিধা অনিচ্ছা বা হাবিলদারের সংসারের কথা বৈঠকে প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাবিলদারকে মারেনি।



'একসপেলড !'

অলক এই শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। অনেকটাই যেন নিয়তি নির্দেশিত দৈব ঘোষণার মতো। বাকি ছ'জন তার সমর্থনে হাত তুলেছিল। তাপস সকলের শক্ত ঘাম চকচকে মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিল। ও নিজেও ঘামছিল। শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে আলোচনা করার তেমন কিছুই ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল স্পষ্ট আর জানাজানি। ওর চোখের সামনে পলকের জন্য একটি প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবার ভেসে উঠেছিল। এবং ও এক মুহূর্ত বেশি তাকিয়েছিল মনীষাব মুখের দিকে। কেউ ওর দিক থেকে বিদ্বেষের চোখ নামায়নি। মনীষা চোখে চোখ রাখতে পারেনি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

অলক প্রথম বলেছিল, 'আমার মনে হয়, তাপসকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। পার্টির নীতি নিয়ে আলোচনা করারও কিছু নেই। তাপস পার্টির নীতিতে বিশ্বাসী নয়, এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। তবু জিজ্ঞেস করছি. কিছু বলার

আছে ?'

তাপস সকলের পাথরের মতো শক্ত আর জ্বলন্ত স্থির-দৃষ্টি চোখের দিকে একবার দেখেছিল। বলেছিল, 'আমি পার্টির মৌল নীতিতে বিশ্বাসী।'

'মিথ্যা কথা।' কল্যাণ বলেছিল, 'আমরা মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি। পার্টির নির্দেশেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ব্যক্তিগত মতামতের কোনো মূল্য নেই। সেটা পার্টি-নীতিরই বিরোধিতা। ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে প্রমাণ হয়ে গেছে, ডেলিবারেটলি পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করা হয়েছে। এটা বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকের জায়গা পার্টিতে নেই, থাকতে পারে না।'

তাপস চুপ করেছিল। তাকিয়েছিল সকলের মুখের দিকে।

হ্যারিকেনের লাল্‌চে আলোয়, পিছনের বড় বড় ছায়ার এপারে, সমস্ত মুখগুলোকে এক রকম দেখাচ্ছিল। চকচকে শক্ত, পাথরের মুখ। জ্বলন্ত চোখ। কেউ একটা কথাও বলছিল না। যেন সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অলকেরও। প্রায় এক মিনিট পরে অলক তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে উচ্চারণ করেছিল, 'একসপেলড।'

সকলেই হাত তুলেছিল। হাতের ছায়াগুলো পিছনের দলা পাকানো ছায়ার মাথার ওপরে যেন বেয়নেটের মতো খোঁচা হয়ে উঠেছিল। তাপস তাকিয়েছিল সকলের দিকে। বুঝতে পারছিল, সকলেই অনুমান করেছিল, সম্ভবত ও কিছু বলবে। কিন্তু ও জানতো, বলার কিছুই ছিল না। পার্টি এখন ওর নিয়তির ভূমিকা নিয়েছে। গ্রুপ এখানে মীট করার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কী না, বা কোনো আলোচনা করেছিল কী না, ও জানে না। অলক ওর নাম বলতে গিয়ে, কমরেড উচ্চারণ করে নি। ওটাই সংকেত হিসাবে যথেষ্ট।

'আমি মনে করি, আমাদের আজকের বৈঠক এখানেই শেষ হওয়া উচিত।' অলক বলেছিল, 'এ বাড়িতে আর কখনও বৈঠক করা বোধ হয় সম্ভব হবে না, কারণ আমরা ধরে নিতে পারি, আজ থেকে এ জায়গা আর নিরাপদ নয়।'

তাপস অলকের দিকে তাকিয়েছিল। কথাগুলো তাপসের উদ্দেশেই ও বলেছিল। ইঙ্গিতটাও স্পষ্ট ছিল। বিশ্বাসঘাতক তাপস এর পরে এ গুপ্ত আস্তানার কথা পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারে। তাপস জানতো, প্রতিবাদ অর্থহীন হতো। সকলেই তখন হাত নামিয়ে নিয়েছিল।

'ওয়াইপ আউট।' কল্যাণের স্বরে চাপা গর্জন শোনা গিয়েছিল। ওর হাত ঠেকেছিল পয়েন্ট থ্রি এইটে। ও অলকের দিকে তাকিয়েছিল।

সবাই অলকের দিকে তাকিয়েছিল। সকলের উত্তেজনা তখন চরমে। তাকিয়েছিল তাপসের দিকে। ওয়াইপ আউট মানে খতম। তাপসকে। তাপস মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এলেও, গলার কাছে ওর নিঃশ্বাস ঠেকেছিল। কিন্তু একবার মাত্র মনীষার দিকে দেখে, মুখ নামিয়ে রেখেছিল। কারোর দিকে না তাকিয়ে অপেক্ষা করেছিল।

'এই ডিসিশন আমরা এখানে নেবো না।' অলক বলেছিল, 'হাতে কিছু সময়

রাখছি।' ও সকলের দিকে তাকিয়েছিল।

মনীষা বলে উঠেছিল, 'রেনিগেড !'

তাপস চোখ তুলে তাকায়নি। কিন্তু মনীষার স্বরে বিদ্বেষ এবং ঘৃণার থেকে ক্ষোভের ঝাঁজ ফুটে উঠেছিল। তাপস মনে মনে অবাক হয়েছিল। মনীষার হঠাৎ 'দলত্যাগী'র কথা মনে এসেছিল কেন? দলত্যাগ ও করেনি, তার কোনো প্রশ্নও ছিল না। মনীষার কি মনে হয়েছিল, তাপস ওদের ত্যাগ করে যেতে চাইছে?

অলক উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার সঙ্গে সকলেই। তাপসও। অলক বলেছিল, 'মনীষা, তোমার যদি তাপসের সঙ্গে এর পরে কোনো কথা থাকে, বলে নিতে পারো। আমরা বাইরে যাচ্ছি।'

সকলেই মনীষার দিকে তাকিয়েছিল। তাপস চকিতে একবার অলকের মুখের দিকে দেখেছিল। তাপস আর মনীষার সম্পর্কের কথা গ্রুপের সবাই জানতো। তাপস এ অঞ্চলে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই মনীষার সঙ্গে ওর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মনোজও জানতো, ঠাট্টা করে বলতো, 'পার্টি করতে এসে প্রেমে পড়ে গেলি তাপস?' তার বেশি কিছু না।

মনোজের বোন দীপাও ঘটনাটা জানতো। দীপা এখন জেলে। বাইরে থাকলে কী বলতো কে জানে। কিন্তু দীপা মনীষাকে তাপসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে সাহায্য করতো। কখনো কখনো তাপসকে ঠাট্টা করে 'কমরেড জামাই' বলতো। তাপস বাইরে থেকে এসেছিল, মনীষা স্থানীয় মেয়ে। দীপার 'জামাই' সম্বোধনের ঠাট্টাটা সেইজন্যই ছিল। অবিশ্যি মনীষার সামনে ছাড়া বলতো না।

অলক, কল্যাণ, কলকাতায় ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় প্রেমে পড়েছিল। তাপসের সঙ্গে বন্ধুর প্রেমিকাদের পরিচয় ছিল। কফি হাউসের রেস্তোরাঁয় গল্প-গুজব হতো। তারাও তাপসের বন্ধু ছিল। কখনও ভাববার প্রয়োজন হয়নি, প্রেম কী, কেন, কেমন করে ঘটে। অনেকেই প্রেম করতো, অনেকে করতো না। তাপসের মনে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। সহপাঠিনী অনেকের সঙ্গেই ওর হৃদ্যতা ছিল। যেমন ছিল অনেক সহপাঠীর সঙ্গে। অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাত্রাভেদ ছিল। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পারতো না। কে-ই বা পারতো। স্মার্ট বলতে যেরকম বোঝায়, ও তা ছিল না। কিন্তু ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকসও ছিল না। বন্ধুদের কাছে ও ছিল সীরিয়াস আর ভালো ছেলে। আসলে ও ছিল অনমনীয় আর জেদী। কখনও কখনও ওর সেই চরিত্রটা টের পাওয়া যেতো। ধরে নেওয়া হয়েছিল, মফস্বলের রক্ষণশীল পরিবারের ছেলেরা যেরকম হয়, তাপস ঠিক সেইরকম।

বন্ধুদের সেই ধরে নেওয়া সম্পর্কে তাপস অবহিত ছিল। জানতো, ওটা একটা কলকাতাই ধারণার মনগড়া তফাত নিশ্চয়ই ছিল। ছেলেবেলা থেকে বেড়ে ওঠার মধ্যে, কলকাতা আর মফস্বলের একটা তফাত কোথাও থাকেই। কিন্তু সেটা নিতান্ত একটা ওপরের ব্যাপার। মূলে কোনো তফাত নেই। চিন্তা ভাবনায় মূলতঃ সবাই এক। জীবনধারণের চেহারাটা আলাদা। সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে

না। কলকাতা আর মফস্বলের অতীতের দূরত্ব আর নেই বললেই চলে। সবই প্রায় একরকম হয়ে উঠেছে। তবু কলকাতা কলকাতাই, নগর এবং রাজধানী।

তাপস ভাবতো, ও মূলতঃ কলকাতার বাইরের অধিবাসী। অথচ ও কলকাতারও। দুয়েব মধ্যে কোনো বিরুদ্ধ টানাপোড়েন ছিল না। পঁয়ত্রিশ মাইলের ব্যবধানে, দু জায়গাতেই ও সহজ আর অনায়াস ছিল। কলকাতার কফিহাউস থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের আধা গ্রামীণ এক প্রাচীন পাড়ার চায়ের দোকান, ওর মনে বিশেষ কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করত না।

কলকাতার সহপাঠিনী আর পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের ছেলেবেলার প্রতিবেশিনী বন্ধু, দু জায়গাতেই ছিল। প্রেম সর্বত্রই। প্রেম কি কোনো আবিষ্কারের ঘটনা? যদি হয়, তা হলে তাপস এখানে এসেই তা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। অনেকটা নিজেকে আবিষ্কারের মতোই। মনীষার চোখের দিকে তাকিয়ে ও প্রথম অনুভব করেছিল ওর মনের জগতে কোথায় একটা ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। অবাক হয়েছিল। চিন্তিত হয়েছিল। এবং বুঝতে পারছিল না, মনীষার নিজের কোনো দায় ছিল কী না। ছিল। সেই সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব অস্পষ্টতা দীপা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

তাপস এ অঞ্চলে আসার পরে পার্টির নির্দেশে ওকে কয়েক মাস মহিমদার বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। তারপরে গ্রামে। গ্রাম থেকে মাঝে মধ্যে শহরে এলে দেখা হতো। তখন উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তর হয়েছিল। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় আবেগ ছিল গভীর। যে-কোনো দিনই তাপসেব মৃত্যু সংবাদ আসতে পারতো। তখন ক্ষণেকের নিবিড় সান্নিধ্য আরও ব্যাকুল করে তুলতো। বর্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুজনেই ছিল জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতির সংকটে উদ্বিগ্ন। মনীষা গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিল। বিয়ে রেজিস্ট্রি করার কোনো উপায় ছিল না। ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। গ্রুপ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।

তারপরে এই পরিস্থিতি। তাপস মুখ ফিরিয়ে মনীষার দিকে তাকিয়েছিল। কোনো প্রত্যাশা বা আবেগ নিয়ে তাকায়নি। মনীষা যা বলবার, তা আগেই বলেছিল। তবু অলকের কথার জবাবে বলেছিল, 'আমার কোনো কথাই নেই। বানচাক্ আর আনার গল্প শোনা আমার শেষ হয়ে গেছে।'

সকলেই অবাক বিভ্রান্ত চোখে মনীষার দিকে তাকিয়েছিল। ওর কথার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি। তাপসের ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। শলোখভের 'এ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন'-এর দুই চরিত্র বান্চাক আব আনা। বিপ্লবী গোলন্দাজ বাহিনীর নেতা ও সদস্য। তাপস মনীষাকে গল্প শুনিয়েছিল। প্রতি দিনই বানচাক আর আনা, রাত্রের গভীরে, প্রতিবিপ্লবী বন্দীদের কামানের গোলায় খতম করে আসতো। বানচাক শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়েছিল। আনা মমত্বের সঙ্গে পার্টির কঠিন কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেই কথাটাই মনীষা বলেছিল। কিন্তু তাপস বলতে পারেনি, বানচাক আর

আনার গল্পের পটভূমি, পরিস্থিতি, কোনোটার সঙ্গেই বর্তমানের কোনো মিল ছিল না।

কল্যাণ বন্ধ দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ করছিল। মহিমদা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কেউ ঘর থেকে বেরোয়নি। তাপসের পথ করে দিয়ে সবাই সরে দাঁড়িয়েছিল। আজ কেউ অন্ধকারে এক সঙ্গে তাপসের সঙ্গে বেরোয়নি। ও আজ একলা। একসপেলড ফ্রম দ্য পার্টি। মনীষার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করেছিল। তাকায়নি। না, প্রেমের জন্য সব কিছু জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। তবু তাপসের বুকে টনটন করে উঠেছিল কেন? মনীষা প্রেমকে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়নি। ও অলকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ও জানতো। অলকও জানতো।

তাপস দরজা দিয়ে বেরোবার সময় মহিমদার দিকে তাকিয়েছিল। মহিমদা তাকাননি। শক্ত মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন। বউদিও। কেবল মানিকের দুই ভাইবোন রাগ রাগ চোখে তাকিয়েছিল। তাপস অন্ধকারে রাস্তায় এসে পড়েছিল। এ শহরে ওর আশ্রয়ে আর ফিরে যায়নি। তখন ও শেষ বাসটা ধরবার কথা ভাবছিল। আশ্রয়ে কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু ও ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। সেই সংস্কৃত পান্ডুলিপি ওর চোখে ভাসছিল। মনে হচ্ছিল, একটা বিরাট কাজ পড়ে আছে। কাজটা শেষ করার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা, সে-কথাই কেবল ভাবছিল। পিছনটাকে একেবারে ভুলে যাবার চেষ্টা করছিল।

সহজে ভোলা সম্ভব ছিল না। শেষ বাসটা পেলেও গ্রুপ ওকে আদৌ শহর ত্যাগ করতে দেবে কিনা, নিশ্চিত ছিল না। আপাততঃ দিলেও পরে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কল্যাণের 'ওয়াইপ আউট!' কিন্তু যা-ই ঘটুক, তাপসের লক্ষ ছিল, শেষ বাস। এবং শেষ বাসটা পেয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় পৌঁছে ট্রেনও ধরতে পেরেছিল। পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে, স্টেশনে যখন পৌঁছেছিল, তখন রাত্রি এগারোটা। গোটা পথটা চোখের সামনে সংস্কৃত পান্ডুলিপি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর বারে বারেই মনে হচ্ছিল, পার্টি কী আশ্চর্যরকম ভাবে নিয়তির ভূমিকা নেয়।

তাপস ট্রেনের একেবারে শেষের কামরায় উঠেছিল। গাড়ি প্ল্যাটফরমে থামবার আগেই ঝটিতি নেমে পড়লো। পিছন দিকের অন্ধকারে লাইনের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল। কিছুটা গিয়ে স্টেশনের দিকে তাকালো। তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, ওকে কেউ অনুসরণ করছে না। বাড়িতে ফেরবার সময়, পুলিশের কথা ওকে মনে রাখতে হয়। এখানেও ওর ওপর নজর রাখা হয়। বাড়িতে দুবার সার্চ হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের সামনে দিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। লাইনের ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে ও পশ্চিমের উঁচু জমি থেকে নিচের দিকে নেমে গেল। স্টেশন, বাজারের আশেপাশে এবং গ্রামের ভিতর দিকেও বিদ্যুৎ এসে গিয়েছে। রাস্তায় আলো নেই। এদিকটা গ্রামের শেষ বলা যায়। পথ চেনা।

অন্ধকারে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বাড়ির সদর দিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। রাত যতোই হোক। এই শেষ ট্রেনটার জন্য বাড়ির সদরে নজর রাখতে পারে।

তাপস বাড়িতে এলে, রাত্রেই আসে। কোনো সময়েই সদর দিয়ে ঢোকে না। বাড়ির পিছন দিয়ে, বাগানের পাঁচিল টপকে ঢোকে। আজও তাই করলো। বাড়ির পিছনে, দূর থেকে অন্ধকারে একবার দেখে নিল। তারপরে, পাচিল টপকে বাগানে ঢুকলো। পুরনো দোতলা বাড়ি। একতলায় রান্না ঘরের দিকে এখনও আলো জ্বলছে। এবং নিচে ওপরে এখনও কোনো কোনো ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রে, ঘরে ঘরে আলো জ্বলবার কথা নয়। রান্নাঘরের দিকে শেষ পাট মেটাবার জন্য আলো জ্বলতে পারে। রাঁধুনি লক্ষ্মীমাসী আর ঝি হয়তো শোবার ব্যবস্থা করছে। রান্নাঘরের দিকেই খিড়কি দরজা। খিড়কির বাইরে একটা পুকুর আছে। পানা পুকুর, ব্যবহার করা হয় না। বাড়ির মধ্যে কুয়ো আর টিউবওয়েল আছে।

তাপস বাগান দিয়ে ঘুরে খিড়কির দিকে গেল। ভাত ব্যঞ্জন কিছু যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে, লক্ষ্মীমাসীর কাছে চেয়ে খেয়ে নেবে। খিদে পেয়েছে খুবই। তারপরে চিলেকোঠায় চলে যাবে। ইদানিং দু-এক দিনের জন্য বাড়িতে এলে ও চিলেকোঠাতেই থাকে। এবার আর দু একদিনের জন্য নয়, বেশ কয়েক-দিন থাকতে হবে। চিলেকোঠায় যে-সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা রয়েছে, যা ও একা-ধিকবার পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ওর পিতামহের একটি বাংলা লিপি, আজ এই মুহূর্তে সেই পাণ্ডুলিপিটা ওকে চুম্বকের মতো টানছে। পিতামহের লিপি ছাড়াই পাণ্ডুলিপিটি পড়ে ও বুঝতে পেরেছিল, তাপসদের এই বন্দ্যোবংশের স্রষ্টা ছিলেন সেই পাণ্ডুলিপিরই রচয়িতা। 'চতুর্নবত্যধিক ষোড়শ শাকাব্দে'—অর্থাৎ সতরশো বাহাত্তর খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এটা উনিশশো বাহাত্তর। একশো বছরে তিন পুরুষের হিসাব ধরলে, তাপস এ বংশের ষষ্ঠ পুরুষের অন্তর্গত। কিন্তু পাণ্ডুলিপির লেখকের জীবিতকাল ধরে তাপসের মনে হয়েছে ও অধস্তন সাতপুরুষ। যে-মুহূর্তে অলক সেই অনিবার্য 'একসপেলড' কথাটি উচ্চারণ করেছিল সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, পাণ্ডুলিপিটি অনুবাদ করা ওর প্রথম কাজ। পাণ্ডুলিপিটি লেখকের জীবনকাহিনী। দু শো বছর আগের যে-জীবন, নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এসে আজ তাপসের কাছে দাঁড়িয়েছে। ও জানে, ওর বাবা জীবিতকালে এ পাণ্ডুলিপি পড়েননি। দাদারা বা আশেপাশে বাড়ির জ্ঞাতি শরিকেরা, কেউ পাণ্ডুলিপিটির কথা জানে না। ইদানিং বছর খানেকের মধ্যে কয়েকবার চিলেকোঠায় আত্মগোপন করে থাকার সময় পুঁথিটি ওর চোখে পড়ে। পড়তে পড়তে একটা অসহায় কষ্ট আর যন্ত্রণা বোধ করেছিল। আজ মনে হচ্ছে, পাণ্ডুলিপিটিকে সংস্কৃত ভাষার থেকে মুক্ত করতে হবে। বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। ছাপা হবে, বা কেউ পড়বে, সেটা বড় কথা নয়। এখন এ কাজটা ওর কাছে অমোঘ, নিয়তির নির্দেশের মতো।

তাপস রান্নাঘরের পিছনের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ করলো। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে উৎকণ্ঠিত স্বর শোনা গেল, 'কে?'

আশ্চর্য! বড়বউদির গলা। বউদি এখনও শুতে যাননি? তাপস দরজায় প্রায় মুখ ঠেকিয়ে বললো, 'আমি, তাপস।'

দরজাটা খুলে গেল। তাপসের গায়ে আলো পড়লো। ও তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। রান্নাঘর লণ্ডভণ্ড। ভাত ব্যঞ্জন ছড়াছড়ি। দুটো উনোন ভাঙাচোরা। লক্ষ্মীমাসী এক পাশ থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তাপস অবাক চোখে বড়বউদির দিকে তাকালো। ঘোমটা খোলা, ধূসর চুলের মাঝখানে সিঁথেয় সিঁদুর। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার?'

বড়বউদি কোনো জবাব না দিয়ে সামনের দরজা দিয়ে দালানে চলে গেলেন। তাপস পিছনে পিছনে গেল। দালানে বড়দা মেজদা সেজদা আর ন'দা এবং বউদিরা সকলেই আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। গোটা দালানে ছড়ানো বাকস স্যুটকেস, ট্রাংক বিছানা জামা কাপড়। দেখলেই বোঝা যায়, একটা তছনছ লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। কোনো ঘর থেকে কান্নার সঙ্গে কথা ভেসে আসছে, '...তার চেয়ে ও যদি মরে যেতো, এ সংসারের কল্যেণ হত। ভগবান ওকে যখন এই মতি দিয়েছে, তখন আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন? আর কতকাল সইতে হবে...।' বৃদ্ধা মা কাঁদছেন। তাঁর কথাগুলো শুনে সেই পাণ্ডুলিপির কথাই মনে পড়ছে। তাপসের দিকে সকলের চোখ। ওর মনে হলো, ও মহিমদার ঘরেই যেন এখনও রয়েছে। দাদা বউদিদের সকলের চোখে বিস্ময় বিদ্বেষ রাগ। এর পরে বলবার দরকার হয় না, পুলিশ ওর খোঁজে এসেছিল। গোটা বাড়ি তল্লাস করে, অন্ধ আক্রোশে সব ভেঙেচুরে ছুঁড়ে তছনছ করে গিয়েছে। এর আগেও দু'বার পুলিশ এসেছে। কিন্তু এতোটা বাড়াবাড়ি কখনও করেনি। দাদারা ইতিপূর্বেই একরকম জানিয়ে দিয়েছে, তাপস যেন আর এ বাড়িতে না আসে। ভাইবোনদের মধ্যে ও সকলের ছোট।

বড়দার বড় ছেলে তাপসের বয়সী। কলকাতায় থাকে। অন্যান্য ভাইপো ভাই-ঝিরা নিশ্চয় ওপরে রয়েছে। ছোটরা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। তাপস জিজ্ঞেস করতে পারছে না, পুলিশ কখন এসেছিল। হয় তো এক দেড় ঘণ্টা আগে এসে-ছিল। রান্না ভাত তরকারি নষ্ট করার অর্থ এখনও অনেকেরই খাওয়া হয়নি।

'পুলিশ তোর খোঁজে এসেছিল।' বড়দা প্রথম মুখ খুললেন, 'তাদের কাছে নাকি খবর ছিল, তুই আজ এ বাড়িতে সন্ধেবেলাতে এসেছিস। পুলিশ যাই বলুক, তুই এখন কী করতে চাস?'

সেজদা প্রায় গর্জন করে উঠলেন, 'কী আবার? এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এখুনি, এ মুহূর্তে।'

'তাতেই বা লাভ কী?' ন'দা শক্ত মুখে, শান্তস্বরে বললো, 'তারপরে আবার

পুলিশ আসবে, আবার এই সব কান্ড করবে। তার চেয়ে থানায় খবর দিয়ে দেওয়াই ভালো।'

ন'দা ধরিয়ে দিতে চায়। স্বাভাবিক। চাকরিতে, ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত পরিবার। এ অত্যাচার তাদের সহ্য করবার কথা নয়। বিশেষ করে, পুরনো শাসক দলকে সমর্থন করা ছাড়া, এ বাড়িতে অন্য কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস বা মতামত নেই। তাপস একমাত্র ব্যতিক্রম। ও বড়দার দিকে তাকিয়ে বললো, 'থানায় খবর দিলেও, তার আগেই আমি পালিয়ে যেতে পারবো। ধরিয়ে দেবার দরকার নেই। আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, এ বাড়িতে আর কখনও আসবো না, কোনো সম্পর্ক রাখবো না। তোমরা পুলিশকে সেটা দেখিয়ে দিও।'

দাদাদের চোখ পরস্পরের দিকে। ভিতর থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, 'কে? কে কথা বলছে?'

তাপস সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'আমি একবার ওপরে যাচ্ছি। আমার কয়েকটা জামাকাপড়, বই খাতা নিয়ে এখুনি আসছি।' বলেই ও দালানের প্রান্তে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। ওপরের দালানে দু-তিনজন বারো চৌদ্দ বছরের ভাইপো ভাইঝি ছিল। তাপসের আসার ঘটনা ওরা টের পায়নি। চমকে অবাক চোখে তাকালো।

তাপস ওর নিজের নির্দিষ্ট ঘরে গেল। সবই এলোমেলো তছনছ অবস্থা। দেওয়াল আলমারিতে রাখা সমস্ত বই, খাটের বিছানা, স্টিলের ট্রাংকে রাখা জামাকাপড় সমস্ত কিছুই ঘরের মেঝেয় ছড়ানো ছিটানো। অনেক বইয়ের এবং খাতার পাতা পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। পুলিশ বই খাতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখেছে। পার্টির কাগজপত্র খোঁজার ছলে আক্রোশবশতঃ খাতাপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে।

তাপস এক মুহূর্ত ঘরের অবস্থা দেখলো। খুঁজে নেবার কিছুই ছিল না। সবই চারদিকে ছড়ানো। ঘরের এক কোণে পড়েছিল, চামড়ার গায়ে কাজ করা একটা বড় ব্যাগ। ও সেটা তুলে নিল। দ্রুত হাতে কয়েকটা জামাকাপড় ঢুকিয়ে দিল ব্যাগের মধ্যে। হাতের সামনে যে কটা আস্ত খাতা পেলো, ঢুকিয়ে নিল। সারা মেঝে খুঁজে খুঁজে গোটা পাঁচেক পেন্সিল আর কলম পেলো। এগুলোর বিশেষ প্রয়োজন আছে। কলমগুলো পরীক্ষা করে নিল। সবগুলোই বন্ধুদের উপহার, বিদেশী কলম। কালি আছে কিনা, পরীক্ষা করে, আগেই একটি খাতার পাতা খুলে দ্রুত হাতে লিখলো 'আমি আর এ বাড়িতে কখনও আসবো না। কোনো সম্পর্কও রাখবো না। অতএব, এ বাড়িতে আমাকে অনুসন্ধান করা বৃথা। —ইতি...' তাপসের গলার কাছে মুহূর্তের জন্য যেন শক্ত কিছু আটকে গেল। বুকের মধ্যে টনটন করে উঠলো। পরমুহূর্তেই একটি নিঃশ্বাস ফেলে তারিখ লিখে নিজের নাম সই করলো। পুলিশ হয়তো এ চিঠির বয়ান বিশ্বাস করবে না। ছলনা আর চাতুরি ভাববে, এবং আবার ওর খোঁজে আসবে। কিন্তু ও অন্তর থেকে মিথ্যা কথা লেখেনি। দাদারা নিশ্চয়ই অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন।

এ কি সবই কোইন্সিডেন্স? আজ পার্টি থেকে একসপেলড। মনীষার সঙ্গে সব সম্পর্কের শেষ। গৃহত্যাগ। এক সপ্তাহ আগেও এর কোনোটাই ও ভাবতে পারেনি। আজকের বৈঠকে ও মিথ্যা বলেনি, পার্টির মৌলনীতিতে ও বিশ্বাসী। যদিও বলার কোনো দরকার ছিল না। কারণ কল্যাণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেছিল, 'মিথ্যাকথা'।.. মনীষাকে নিয়ে ও অনেক কথা ভবিষ্যতের জন্য ভেবেছিল। আজ সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মনীষা ওর কাছে যা ছিল, তা-ই আছে। এই সব ভাবতে ভাবতেই, পাণ্ডুলিপিটার কথা ওর মনে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা বিভ্রান্তি, শেষ বিদায়ের কষ্ট ওকে অন্যমনস্ক করে তুলেছিল। পাণ্ডু-লিপিটাই ওকে বিদ্যুচ্চমকে চকিত করে তুললো। খাতার পাতা থেকে লেখা কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখলো। ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত ঘরের বাইরে এলো।

ভাইপো ভাইঝিরা দালানে দাঁড়িয়েছিল। সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত অবাক। স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির মধ্যে ওদের চোখের সামনে পুলিশ তাণ্ডব করে গিয়েছে। আর সেটা ওরই জন্য। কিছু বলতে ইচ্ছা করলেও কোনো কথা বলতে পারলো না। একরকম ছুটেই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দেখলো, ছাদের দরজাটা খোলা। তার মানে পুলিশ চিলেকোঠায়ও এসেছিল। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। চিলেকোঠায় পাণ্ডুলিপিটা ছিঁড়েখুঁড়ে রেখে যায়নি তো?

তাপস খোলা দরজা দিয়ে ছাদে পা দিয়ে ডান দিকে সুইচে হাত বাড়ালো। বাড়িয়েই তৎক্ষণাৎ হাত ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ছাদে বাতি জ্বলে উঠলেই দূর থেকে দেখা যাবে। ও ডানদিকে চিলেকোঠার সিঁড়িতে পা দিয়ে দেখলো ঘরের দরজা খোলা। এটা ঠাকুরঘরও বটে। বংশের গৃহদেবতা নারায়ণের শিলা আছে। এখনও প্রতিদিন পূজা হয়।

তাপস দরজাটা বন্ধ করে দিল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে কাঠি জ্বাললো। উঁচু একটা ধাপে নারায়ণশিলা ও অন্যান্য দেবদেবীর পট। গীতা চণ্ডী এবং ব্রতকথার বই, চন্দন আর সিন্দুর চর্চিত। অন্য পাশে, কিছু পুরনো বই। তার মধ্যেই সেই পাণ্ডুলিপিটি থাকবার কথা। যার দু পিঠে, দুটি কাঠের মোটা তক্তা দিয়ে বাঁধা। পাতাগুলো আলগা।

সব কিছু দেখে ওঠবার আগেই দেশলাইয়ের কাঠি নিভে গেল। তাপস আবার একটি কাঠি জ্বালিয়ে নারায়ণ শিলার কাছে রাখা প্রদীপটি জ্বালালো। দেখলো, সমস্ত কিছুতেই হাত পড়েছে। পুরনো বইগুলো ছড়ানো। তার মধ্যে পাণ্ডুলিপিটি, কাঠের তক্তার জোড় খোলা। পুলিশ এটিতেও হাত দিয়েছে। বাতাস থাকলে তুলোট কাগজের জীর্ণ পাতাগুলো ভেঙেচুরে উড়ে যেতো। এ বন্ধ ঘরে সে সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন আর কাঠের তক্তার জোড় দিয়ে বাঁধার সময় নেই। ব্যাগের ভিতর থেকে একটি কাপড় বের করে ভাঁজ খুলে পাণ্ডুলিপিটি জড়িয়ে নিল। সাবধানে ঢুকিয়ে দিল ব্যাগের ভিতরে। প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে দরজা

খুলে বাইরে এলো। দ্রুত নেমে এলো নিচে।

দাদারা কিছু আলোচনা করছিলেন। তাপসকে দেখে থেমে গেলেন। মা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাপসকে দেখেই ডুকরে উঠলেন, 'ওরে সর্বনেশে, তুই কি এই বংশ, এ সোনার সংসার ছারেখারে দিবি ?'

তাপস জানে, মায়ের সঙ্গে এখন কোনো কথা বলা নিরর্থক। ও পকেট থেকে লেখা কাগজটা বের করে বড়দার দিকে বাড়িয়ে দিল। বড়দা হাতে নিয়ে পড়লেন। পড়ে মেজদার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাপস বললো, 'আমি যাচ্ছি। পুলিশ আমার হাতের লেখা চেনে। তবু হয়তো বিশ্বাস করবে না, ভাববে এটা একটা চাল। কিন্তু এ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। আমার আজ আসা, আর চলে যাবার কথা পুলিশকে সবই বলবেন। কলকাতার হায়ার অথরিটির সঙ্গে যোগা-যোগ করে দেখতে পারেন, তাতে ফল হতে পারে।' ও বউদিদের দিকে একবার দেখে আর একবার মায়ের দিকে দেখলো। এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকেই। রান্না-ঘর থেকে বাগান এবং বাগানের পাঁচিল টপকে বাইরে। দাঁড়াতে ভরসা পেলো না। অন্ধকারের চেনা পথে উত্তরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

কলকাতায় গেলে হয়তো আশ্রয় একটা জুটতে পারে। কিন্তু আশা কম। এখন ট্রেনও নেই। সকালে ট্রেনে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সারা রাত্রি পথে পথে ঘোরা বিপজ্জনক। উত্তরে এগিয়ে গেলেও ক্রমেই ও পশ্চিমের দিকে বাঁক নিয়ে চলেছে। ও যেন এখনও নিশ্চিত না, কোথায় যাবে। অথচ ওর চোখের সামনে গঙ্গা ভাসছে। ওর চেতন ও অচেতন মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। একটা অচেনা নিরাপদ আস্তানার চিন্তা ওর মস্তিষ্ক জুড়ে রয়েছে। কোথায় গেলে সেরকম একটা আস্তানা পাওয়া যাবে, এই অনিশ্চিত অনুসন্ধিৎসার মধ্যেও ও ক্রমেই পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর চোখের সামনে গঙ্গা ভাসছে। টাকার চিন্তাও মাথার মধ্যে রয়েছে। পকেট একেবারে শূন্য নেই। অন্ততঃ চল্লিশ টাকার কিছু বেশি ওর পকেটে আছে। পরশু দিনই পঞ্চাশ টাকা মনীষা ওকে দিয়েছিল। সেই দিনই কোর্টের হাবিলদারকে মারার কথা ছিল। মনীষা ওকে প্রায়ই টাকা দিত। গ্রুপের কেউ এ কথা জানতো না। মনীষা কিছু দিতেই বাকি রাখেনি। ও এক সঙ্গে অনেক টাকা দিয়ে রাখবার কথাও বলতো। তাপস নেয়নি। অনেক টাকা কাছে রাখার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, বেশি টাকা থাকলে দূরে কোথাও চলে যাওয়া যেতো। উড়িষ্যা বা বিহারের কোনো অঞ্চলে। যদিও অচেনা জায়গাও নিরাপদ নয়। অচেনা জায়গায় অচেনা লোক, স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ জাগায়।

তাপস এই সব চিন্তার মধ্যেও গ্রামগুলোর বাইরে দিয়ে ক্রমেই পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলেছে। মনে মনে একটা হিসাব আছে, চার থেকে পাঁচ মাইল। ওদের বাড়ি থেকে গঙ্গার দূরত্ব। গঙ্গা ক্রমেই এই পূব দিকে থাবা বাড়িয়ে, মাটি গ্রাস করছে। ওপারের পশ্চিমে চর পড়ছে। গঙ্গার ধার খাঁ খাঁ করছে। চাষের উঁচু জমির পরেই গঙ্গার থাবা গ্রামগুলোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কয়েক বছর

ধরে খুব ধীরে এপার ভাঙগছে। কিন্তু ওর চোখের ওপর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে. ভাঙা ঘাট। যার ওপরের চাতাল, দুমড়ে উলটে একটা খোঁচা বোলডারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির ধাপগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। পাশেই পুরনো বটগাছ, যার অজগরের মতো শিকড় পাশের গঙ্গাযাত্রীর ঘরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সেই জায়গা এখন শ্মশানের থেকেও যেন ভয়ংকর। একটা ভুতুড়ে পরিবেশ। লোকজন কেউ ওদিকে যায় না। গঙ্গাযাত্রীর সেই ঘরটার এখন কী অবস্থা ?

তাপস কতোক্ষণ হেঁটেছে হিসাব করতে পারে না। কোথাও কোথাও কাদা আর পাঁকে স্যান্ডেল কোঁচার কাপড় ভিজে মোটা আর ভারি হয়ে গিয়েছে। ওর চোখের সামনে গঙ্গা। মাথা উঁচু বোলডারের মতো সেই চাতাল। বটের অন্ধকার ঝুপসিতে ঝুরি আর শিকড়ের খামচার মধ্যে গঙ্গাযাত্রীর ঘরটা ঢাকা পড়ে আছে। আগে চাতালের ওপর দিয়ে ঘরটার মধ্যে যাওয়া যেতো। এখন বটের মোটা গুঁড়ি, শিকড় আর ক্ষয়ে যাওয়া ভিতের এবড়ো খেবড়ো চাংড়ার ওপর দিয়ে ঘরে ঢোকা যায়। ভিতরে কি কোনো মানুষ আছে ? সম্ভবত না। থাকলে সাপ খোপ বিছে থাকতে পারে। কয়েক বছর আগেও এ ঘরে দু একজন ভিখিরি এসে থাকতো। তার আগে গঙ্গার ধারের গ্রামের লোকেরা এটাকে তাদের আড্ডা ঘর হিসাবে ব্যবহার করতো।

দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে লাভ নেই। নিভে যায়। এ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না। তাপস গাছের গুঁড়িতে উঠে সাবধানে শিকড়ের সন্ধানে পা বাড়ালো। শিকড়গুলো বিরাট আর চওড়া। কয়েকটা শিকড় পেরিয়ে ভাঙা ভিতের ছোঁয়া পেলো। খানিকটা ওপরে উঠে, একটা গাঢ় অন্ধকার হা মুখের সামনে দাঁড়ালো। ঘরে ঢোকার দরজা। পাল্লা চৌকাট কিছুই নেই। গঙ্গার স্রোতে চকিত আলোর রেখা। অন্ধকারের আলো না, আকাশের তারার প্রতিবিম্বরা স্রোতের ধারায় অস্থির বেগে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাপস হাতের ব্যাগটা দু হাতে চেপে ধরলো। আশ্চর্য ! ও গঙ্গাযাত্রীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ও এখানেই আসতে চেয়েছিল। এই মুমূর্ষু ঘরে। বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে এই আস্তানাটাই ওর মস্তিষ্কে বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝিলিক দিয়েছিল। নিশ্চিত ছিল না। তবু ওর ভিতর থেকেই কেউ যেন এদিকে ঠেলে এনেছে। গঙ্গাযাত্রীর ঘর। পান্ডুলিপিটা কি জীবন্ত ? না হলে, এই গঙ্গাযাত্রীর ঘরেই ওকে আসতে হলো কেন ? পান্ডুলিপিরই নির্দেশ নাকি ?

তাপসের ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটলো। ও অন্ধকার ঘরের ভিতর পা দিল। আর তৎক্ষণাৎ ঘড়ঘড়ে গলায় কেউ কেশে উঠলো। মানুষ ! মানুষের কাশি। মানুষ আছে এখানে ? তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'কে ?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু খস খস শব্দের সঙ্গে আঙুল মটকাবার মত শব্দ শোনা গেল। তারপরেই মেঝেতে কোনো ধাতব শব্দের ঘষা লাগার শব্দ। কাশির পরে দীর্ঘশ্বাস এবং ঘড়ঘড়ে গলায় নিরীহ স্বর শোনা গেল,

'আমি অকুর, ভিখ্ মেগে খাই, এখেনে থাকি। কারুর কোন ক্ষতি করিনে বাবা। তাড়িয়ে দেবে আমাকে?'

তাপস মনে মনে হাসলো। কে কাকে তাড়ায়। ও বললো, 'না, তাড়াবো কেন? বাতি টাতি আছে?'

'বাতি কোথায় পাব বাবা?' অকুর নামের মানুষের স্বর শোনা গেল, 'তেল কোতায় পাব? ডিবে নণ্টন কিছু নেই। আগুন জ্বালবার কাটকুটো আছে, তা সে ত নিবে গেছে। স্যালাই একটা আছে।'

স্যালাই মানে দেশলাই। লোকটাকে বুড়ো মনে হচ্ছে। এখনও তা হলে এ ঘরে ভিখিরি থাকে? তাপস বললো, 'দেশলাই আমার কাছেও আছে। একটা কোনো আলোটালো জ্বালতে পারলে ভালো হতো।'

'অ্যাই, হ্যাঁ, মনে পড়েচে।' অকুর ঘড়ঘড়ে স্বরে বললো, 'কড়ে আঙুলের মতন এ্যাটটা মমবাতি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, দেখছি সেটা কোতায় আছে।'

তাপস অকুরের স্বর লক্ষ করে দু পা এগিয়ে গেল। গঙ্গার দিকে দুটো পাল্লাবিহীন দরজা। অকুর একটা কোণে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। সে কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করছে। খস খস, ঠুং ঠাং নানারকম শব্দ হচ্ছে। শোনা গেল, 'পেয়েছি।'

তাপস ব্যাগটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বাললো। গঙ্গার দিকের খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া আসছে। ও পিছন ফিরে অকুরের দিকে এগিয়ে গেল। একরাশ গোঁফ দাড়ি আর মাথা ভরতি চুলের মাঝখানে দুটো চোখ বিন্দুর মতো দেখা গেল। বাড়ানো হাতে একটা দু ইঞ্চি লম্বা সরু মোম-বাতি। তাপস সেটা নিয়ে জ্বালালো। সামান্য আলো, বাতাসে ছোট শিখা কাঁপছে। নিজের শরীরের আড়ালে মোমবাতিটা রেখে ও ভালো করে অকুরের দিকে দেখলে। নিরীহ বুড়ো মানুষ। তাপসের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। একটা চটের ওপর সে বসে আছে। ওটার ওপরেই শুয়েছিল। পাশে কয়েকটা ঝোলাঝুলি। কাছেই কয়েকটা ইঁট জড়ো করে উনোন করেছে। তার ওপরে একটা কালো মাটির হাঁড়ি। আরও কয়েকটা মাটির মালসা, গেলাস ইত্যাদি রয়েছে। অকুরের সংসার।

'মোমবাতিটা আমাকে দাও বাবা, আমি রাখচি।' অকুর হাত বাড়ালো 'নিববে না।'

তাপস মোমবাতিটা অকুরের হাতে দিল! অকুর পিছন ফিরে কোণের দিকে একটা লোহার ছোট কৌটার মধ্যে বসিয়ে দিল। আলো কমে গেল। কিন্তু মোটা-মুটি সবই দেখা যাচ্ছে। কৌটার ভিতরে হাওয়া ঢুকছে না। ঘরের মেঝে এবড়ো খেবড়ো হলেও মোটামুটি পরিষ্কার আছে। অকুরই নিশ্চয় পরিষ্কার রাখে। তাপস ব্যাগটা সরিয়ে এনে বললো, 'বসতে পারি?'

'কেন বসবে না বাবা?' অকুর মোটা ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, 'এ ঘরের মালিক ত কেউ নয়।'

তাপস পকেট থেকে এই প্রথম সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। অকুরকে জিজ্ঞেস করলো, 'খাবে?'

'দাও।' হাত বাড়ালো।

তাপস অকুরকে একটা সিগারেট দিল। নিজে একটা নিল। দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে আগে নিজেরটা ধরালো। অকুরেরটা ধরাতে গেল। অকুর তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত কাটিটা নিয়ে নিজেই নিজেরটা ধরালো। তার দাড়ি বুকের ওপর নেমে এসেছে। মাথার চুলে জটা। গোঁফ দাড়ি চুল আর ভুরু সবই ধূসর আর তামাটে দেখাচ্ছে। কোল বসা চোখ দুটো আকাশের দূরের তারার মতো স্তিমিত। কিন্তু খুব একটা অশক্ত মনে হচ্ছে না। গায়ে একটা ময়লা কাঁথার মতো কিছু জড়ানো। তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কতোদিন আছো?'

'তা পেরায় বছর খানেক।' অকুর কাশতে আরম্ভ করলো। তাপস একটু অপেক্ষা করলো। কাশিটা সামলে ওঠার পরে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'এদিকে লোকজন আসে?'

'না, কেউ আসে না।'

'তুমি কি রোজ ভিক্ষেয় বেরোও?'

'শরীর গতিক খারাপ থাকলে এক আধ দিন বাদ যায়। চাল ডাল বেশি জুটলে মাজে মধ্যে কামাই দিই।'

তাপস চুপচাপ মিনিট খানেক সিগারেট টানলো। তারপরে বললো, 'আমি এখানে কয়েকদিন থাকতে চাই।'

অকুরের দুই বিন্দু স্তিমিত চোখে বিস্ময়! বললো, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বাবু ভদ্দরনোকদের ছেলে। এখানে কী করে থাকবে?'

'সে আমি যেমন করে হোক থাকবো'। তাপস অকুরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিন্তু তুমি একটা কথা দিলে, তবে আমি থাকতে পারবো।'

অকুর জিজ্ঞেস করলো, 'কী কতা বাবা?'

'তুমি যখন ভিক্ষেয় বেরোবে, আমার কথা কারোকে বলবে না।'

অকুর নিরীহ অবাক স্বরে বললো, 'তা যদি বল, আমি কেন নোককে বলতে যাব?'

'তুমি যেমন ভিক্ষেয় বেরোও, সেইরকমই বেরোবে। আমি তোমাকে কয়েকটা করে টাকা দেবো। আমার জন্য চাল ডাল কিনে আনবে। তোমার সঙ্গেই আমি খাবো। তুমি কতো দূরে যাও?'

'তা দিন বুঝে ইস্টিশানতক যাই। কিন্তু বাবা, আমার কাছে টাকা দেখলে নোকে আমাকে চোর ভাববে। আমি ভিখিরি মানুষ, টাকা দিয়ে সওদা করব কেমন করে?'

সহজ সত্যি বাস্তব কথা। অথচ তাপসের কাছে কিছু খুচরো ছাড়া, কয়েকটি দশ টাকার নোট। শুধু খাওয়া না। তিন চার দিন থাকতে হলেও কয়েকটা মোমবাতি, কিছু সিগারেটও দরকার হবে। অবিশ্যি এসব ভেবে ও এখানে আসেনি।

জানতো না, অকুরকে পাওয়া যাবে। এখন মনে হচ্ছে, এগুলো অত্যাবশ্যক। ও ব্যাগটার ওপর হাত রেখে বসে পড়লো। চিন্তিত স্বরে বললো, 'তাহলে কী করা যায় অকুর। আমার কাছে তো টাকার নোট ছাড়া কিছু নেই।'

অকুর কোনো কথা বললো না। গঙ্গার ছলছল শব্দ আর ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। মোমবাতির আলোয় এ ঘর, অকুর, এবং তাপসের নিজেকেও যেন অবাস্তব লাগছে। অকুর একটু কেশে বললো, 'আমার কাছে অনেক খুচরো পয়সা আছে, তা দিয়ে তোমার সওদা করে দিতে পারি। তুমি হিসেব করে আমাকে নোটের টাকা দিও।'

আর একটা সহজ সত্যি বাস্তব কথা। তাপস খুশি আর অবাক চোখে অকুরের দিকে তাকালো। অকুর ওর দিকে তাকিয়েছিল। অকুরের চোখে দ্বিধা ও সংশয়। নিজের পয়সার কথা বলে সে একটু ভয় পেয়েছে। তাপসকে বিশ্বাস করে পয়সার কথা বলা ঠিক হয়েছে কিনা বুঝতে পারছে না। ও বললো, 'তুমি যদি বল, তা হলে আমি এখনই তোমাকে টাকা দিয়ে রাখতে পারি।'

'তার কী দরকার বাবা?' অকুর ঘড়ঘড়ে স্বরে বললো, 'তোমাকে বিশ্বেস করে বলেচি। টাকা তুমি পরে হিসেব করে দিও। আমার পয়সা ত এ ঘরেই থাকবে। কিন্তু তুমি কে বাবা? এখেনে কেন থাকবে?'

তাপস বললো, 'ভয় নেই, আমি চোর ডাকাত নই। দায়ে পড়ে আমাকে কয়েকদিন এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে। তারপরেই আমি আবার চলে যাবো। তোমাকে বিশ্বাস করেই আমাকে এখানে থাকতে হবে। জানাজানি হলে আমি বিপদে পড়ে যাবো।'

'বলেচি ত বাবা, আমি কারুককে তোমার কথা বলব না।' অকুর তার শ্লেষ্মা জড়ানো স্বরে বললো, 'এখেনে কেউ আসেও না, তুমি নিশ্চিন্দিতে থাক। তোমাকে দেখে চোর ডাকাত মনে হয় না। কিন্তু তোমার মতন ছেলে এখেনে থাকবে কেমন করে, আমার হাতে খাবে কেমন করে, তাই ভাবচি।'

তাপস বললো, 'আমি ঠিক চালিয়ে নেবো।'

অকুর কোনো কথা বললো না। বাইরে একটা পাখি ডেকে উঠলো। একবার, আচমকা। তাপস গঙ্গার দিকে দেখছে। নদীর স্রোতে তারার বাঁকা ঝিলিক আর দেখা যাচ্ছে না। মেঘ করলো নাকি? কিন্তু ওপারের অন্ধকার আকাশে, গাছ-পালার রেখা ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। গঙ্গাযাত্রীর ঘর। তাপসকে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এখানেই আসতে হলো। বাস্তবতার মধ্যেও কী অসামান্য অপ্রাকৃত রহস্য। পাণ্ডু-লিপির লেখকের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীর ঘরের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেখান থেকেই তার নতুন জীবনের শুরু। গঙ্গাযাত্রীর ঘর মানেই মুমূর্ষু গৃহ। পুণ্য মৃত্যুর শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা গৃহ। কতো লোক এ ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে? একমাত্র, গঙ্গার নিরন্তর উজান ভাটা, এ ঘরের বোবা ইঁট, ভাঙা ঘাট তার হিসাব জানে। যে-হিসাবের সংখ্যা মানুষ রাখেনি।

আবার পাখি ডেকে উঠলো। একবার না কয়েকবার। একটা না কয়েকটা।

অকুর বললো, 'রাত পুইয়ে এল। দেখতে দেখতে চাদ্দিকে দিন হয়ে যাবে।'

অকুরের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে গাছের পাতায় ঝাপটানো শব্দ শোনা গেল। আবার পাখির ডাক। তাপস বুঝতে পারলো, এ সবই রাত শেষের লক্ষণ। আকাশের তারা ক্রমে বিলীয়মান। নদীর স্রোতে ঝিলিক নেই। ওপারের আকাশে গাছপালার রেখা দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অকুর আবার বললো, 'তুমি যদি বাবা লোকজনের নজর ফাঁকি দিয়ে থাকতে চাও, তবে ঘাটের কাজ সেরে এস। নাইতে হলে এখন নেয়েধুয়ে নাও। দিনের বেলা দূরের মাঠ ঘর থেকে লোকজন দেখতে পাবে।'

অভিজ্ঞ অকুরের প্রত্যেকটা কথাই বাস্তব। তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'অকুর, তুমি কি রাস্তাঘাট থেকে খাবার কুড়িয়ে আনো ?'

'না বাবা, সে আমি পারিনে।' অকুর তার ঘড়ঘড়ে স্বরে বললো, 'আমি জাত চাষী। আবাদ ছিল। দিনকাল খারাপ হল। নিজে বুড়ো হলাম। ছেলেরা খেতে দিতে পারল না। না খেয়ে মরতে বড় কষ্ট। আমি ঠাকুরের নাম নিয়ে মেগে পেতে খাই। ঘুরতে ঘুরতে এ ঘরে এসে উঠেচি, গঙ্গার ধারে এখেনেই মরব। এখেনে মলে পুণ্যি। রাস্তাঘাটে কুড়িয়ে খাব কেন ?'

তাপসের বিবেকে লাগল। এ ভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি। কিন্তু অকুরও তা হলে একরকম গঙ্গাযাত্রী। ও বললো, 'কিছু মনে করো না। অনেককে দেখেছি, রাস্তাঘাটে ময়লা ঘাঁটে, তাই বলেছি।'

'না বাবা, আমি তা ঘাঁটিনে। ভগবান এখনও দুটো জুটিয়ে দেয়। তবে, না খেয়ে মরতে বড় কষ্ট। কপালে কী আছে জানিনে।'

তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি চা খাও ?'

'খাই। চা আর গুড় আছে। দুধ নেই। ঘড়ায় গঙ্গার জল আছে। খাবে ত বল, কাটকুটো জেবলে, চা করি।' অকুর ঘড়ঘড়ে স্বরে বললো, 'খৈ আছে, এক মুঠো চিবতে পাব। মুড়ি রাখিনে। দাঁত নেই, চিবতে পারিনে।'

বিপ্লবী তাপস হঠাৎ যেন ভাগ্যবাদী হয়ে উঠলো। নিজেকে ওর সৌভাগ্যবান মনে হল। ও দু চোখ ভরা খুশি আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে অকুরের দিকে তাকালো। অকুর আর তাপসের জবাবের অপেক্ষায় থাকল না। সে ইঁটের উনোনে কাটকুটো জেবলে একটা টিনের কৌটায় জল গরম করে চা তৈরি করল। একটা মাটির গেলাসে চা ঢেলে তাপসকে দিল। দেওয়ালের ফোকড় থেকে একটা ঠোঙা বের করে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এতে খৈ আছে।'

ক্ষুধার্ত তাপস সাগ্রহে আগে চায়ের মাটির গেলাসে চুমুক দিল। গিলতে গিয়ে গলায় আটকালো। মনে হলো, ভেলি গুড় গোলা গরম জল। কিন্তু গিলে ফেললো। খৈ মুখে চিবোতে চিবোতে কয়েক চুমুকেই সব চা খেয়ে নিল। প্রথম চুমুকটায় যা বাধা। তারপরে সবটাই অমৃত। একটা সিগারেট ধরিয়ে, উঠে দাঁড়ালো। ব্যাগ থেকে একটা ধুতি বের করে বললো, 'আমি ঘাট সেরে আসি। মনে হচ্ছে, ভোর হয়ে আসছে।'

'হ্যাঁ। আর দেরি করো না বাবা। তুমি এলে আমি যাব। ভাঙ্গা ঘাটের দিকে যেও না, ওখেনে জলে ঘূর্ণী আছে, মুণ্ডু ধরে তলিয়ে নিয়ে যাবে। গাঁয়ের কয়েক-জন মরেছে, তাই আর এখেনে কেউ আসে না। ঘরের পেছু দিয়ে দখিনে গিয়ে হাঁটু জলে ডুব দিয়ে এস। গঙ্গা এদিকটা খাচ্ছে ত, তলে বড় টান আর ঘূর্ণী। এ ঘরটা কবে ভেঙ্গে পড়বে, কে জানে।'

অকুর সব জানে। বাঁচবার জন্য জানতে হয়েছে। ছেলেরা খেতে দিতে পারেনি। কিন্তু তাদের দোষ দেয়নি। না খেয়ে মরা বড় কষ্ট। তাই এই বৃদ্ধ বয়সে বেরিয়ে পড়েছে। নদীর কোথায় টান ঘূর্ণী, সবই জানে। তাপস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার একেবারে কাটেনি। পূবের দূরে আকাশে যেন জ্যোৎস্নার আবছা আলো। পাখিগুলো এখন গলা খুলে ডাকতে আরম্ভ করেছে।



অকুর বেরিয়ে গিয়েছে। তাপস ব্যাগের ভিতর থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করেও আবার ঢুকিয়ে রাখলো। বাইরে রোদ উঠেছে। নদীতে ছোট ঢেউ, ভাটার টানের স্রোতে রোদের ঝলক। ওপারে ধূ ধূ চর। রোদ লেগে বালি চিকচিক করছে। চরের ওপারে গ্রাম। গাছপালার আড়ালে ঘর দেখা যায়। মানুষ চোখে পড়ে না। তাপসের দু চোখ জুড়ে ঘুম আসছে। ও ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো। ভেজা কাপড়টা মেলে দিয়েছে, ঘরের দেওয়ালে দুটো পেরেকের সঙ্গে। ধোয়া কাপড়ের সঙ্গে ধোয়া জামা গায়ে। মেঝেটা ঠাণ্ডা।

কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই তাপস আবার উঠে বসলো। মনে হচ্ছিল, গভীর ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। বসে থাকতে পারছে না। অথচ ঘুম আসছে না। শুয়ে থাকতেও পারছে না। মাথার নিচে ব্যাগের ভিতর থেকে পাণ্ডুলিপিটা যেন ওকে ঠেলে তুলে দিচ্ছে। ক্লান্তি জড়তা ঘুম সবই যেন শরীর থেকে ঘুচে যাচ্ছে। ও ব্যাগের ভিতর থেকে কাপড়ে মোড়া পাণ্ডুলিপিটা বের করলো। খাতাকলম সবই তুলে সামনে রাখলো। আস্তে আস্তে কাপড়ের ভাঁজ খুললো। ঘরে তেমন বাতাস আসছে না। দক্ষিণ দিকে কোনো দরজা জানলা নেই। পশ্চিমের দরজা দিয়ে যে হাওয়া আসছে তা ঘরের শেষ কোণ অবধি পৌঁছোচ্ছে না। তবুও পাণ্ডুলিপিটাকে কাপড় দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে রাখলো। কালো অক্ষরে সংস্কৃত গদ্য রচনা। অক্ষরগুলো পেঁপের বীচির মতো মাপ, স্পষ্ট, হাতের লেখায় পরিচর্যার ছাপ। তাপস একাধিকবার এই পাণ্ডুলিপি পড়েছে। এইভাবে শুরু হয়েছে :

'সপ্তত্রিংশদধিক সপ্তদশতম শাকে চৈত্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যাংতিথৌ ॥

'প্রবলৎ বিধানানুসারেণ গ্রন্থারম্ভঃ গৃহনির্মাণাদি শুভ কর্মণাং বিঘ্নবিনাশায় মঙ্গলাচরণং বিধিয়েম ॥ অদ্যাগহম আত্মজীবন বৃত্তানি রচয়িতুম যতে ॥ মমতু

নাস্তি কাপি বিঘ্নশঙ্কা॥ ততঃ মঙ্গলাচরণপ্রবৃত্তেঃ হেতুর্নাস্তি॥ যতঃ মে বিঘ্ন-বিঘ্নাচিন্তা সমানা॥ পাপপুণ্যয়োঃ কয়োপি ভেদম নাহম গণয়ামি॥ অতএব প্রায়শ্চিত্তং ব্যর্থম্ প্রতীয়তে॥ ঈশ্বরঃ মানবজন্ম কারণং তৎপারিণামশ্চ ধর্মাধর্মৌ জ্ঞানাজ্ঞানে স্বর্গনরকে সর্বমিদং বিজ্ঞজননাং পরিকল্পনামাত্রম্ ইতি—'

তাপস থামলো। সেই যুগের একজন মানুষ সমস্ত প্রচলিত বিশ্বাসকে কীভাবে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন, প্রথমেই তিনি তা ঘোষণা করেছেন। এই রচনার বাংলা ওর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। তবু, খাতা সামনে টেনে নিয়ে হাতে কলম তুলে ও শেষবারের জন্য আর একবার ভাবলো। বাঙলা অনুবাদের চিন্তায় প্রথমেই ওর মনে এসেছিল বঙ্কিমী গদ্য। তারপরে ভেবেছিল, সেকালের সংবাদপত্রের বাঙলা রচনার কথা। কোনোটাই পছন্দ হয়নি। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকারের কথ্য ভাষার রচনা, রামমোহন, রাজীবলোচন থেকে হুতোম পর্যন্ত ওর মস্তিষ্কে পাক খেয়েছে। কিন্তু সে-সব কোনো ভাষাই ওকে আকর্ষণ করেনি। অথচ একে-বারে হালের কথ্য বাঙলা সাহিত্যের ভাষাও এই অনুবাদের ক্ষেত্রে যেন বেমানান মনে হয়েছে। ও স্থির করেছে, সহজ সরল সাধুভাষায় অনুবাদই ঠিক। লেখক নিজে কোথাও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেননি। অথচ তাঁর সংস্কৃত ভাষার মধ্যে, যাকে বলে ক্লাসিকের ছোঁয়া, তাই রয়েছে। সহজ সরল নির্ভুল ভাষা তাঁর আয়ত্তে ছিল। পণ্ডিত মূর্খের অপটুতার ছাপ কোথাও নেই। যা সে-যুগে, কিংবা তাঁর যুগে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিত জ্যোতিষ আর বৈদ্যদের মধ্যে ছিল।

তাপস সহজ বাঙলা ভাষার সঙ্গে ক্রিয়াপদগুলো সাধুভাষায় ব্যবহারের কথা ভেবেছে। প্রয়োজনে শকাব্দ এবং কিছু কিছু কথা ওকে বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। লেখা শুরু করার মুহূর্তে ও একবার গঙ্গার দিকে তাকালো। কিন্তু গঙ্গাকে দেখছে না। কল্পনায় একটি পুরুষকে ও যেন একবার দেখে নিতে চাইলো। ইন্দ্রনীল পাথরের মতো যাঁর গায়ের রঙ—অর্থাৎ (সম্ভবতঃ) উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘদেহী, দীর্ঘ কেশ, উন্নত নাসা, মধ্যমাকৃতি, কালো চোখ, গোঁফদাড়িহীন মুখ। এই সব বর্ণনাগুলো রচয়িতার নিজের লেখার মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তাপস লিখতে আরম্ভ করলো :

'সতরশ সাঁইত্রিশ শকাব্দ (১৮১৫ খৃষ্টাব্দ) চৈত্র মাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টম তিথি।

'প্রচলিত বিধান অনুসারে গ্রন্থরচনা আরম্ভ গৃহ নির্মাণাদি শুভকাজে বিঘ্নের বিনাশের কারণে মঙ্গলাচরণ করা বিধি। আজ আমি আত্মজীবনী বৃত্তান্ত শুরু করিতেছি। (কিন্তু) আমার কোনো বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। অতএব মঙ্গলা-চরণেরও কোন হেতু নাই। আমার বিঘ্ন অবিঘ্ন ভাবনা সকলই সমান। পাপ পুণ্যে কোন ভেদ গণি না। অতএব প্রায়শ্চিত্ত অর্থহীন (ব্যর্থ)। ঈশ্বর, মানুষের জন্মের কারণ, পরিণাম ধর্মাধর্ম জ্ঞান-অজ্ঞান স্বর্গনরক সমস্তই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কল্পনামাত্র—অর্থাৎ মিথ্যা। এই মিথ্যা লইয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। কারণ

অন্যথায় বাঁচিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। সকলই মানুষের অবস্থাবিশেষের দ্বারা বিচার করা হয়। সে ঈশ্বর হউক, জ্ঞান ধর্ম পাপ পুণ্য হউক, স্বর্গ নরক হউক, মানুষের জন্মের পরিণাম, অতীত ভবিষ্যৎ, যাহা কিছু ভাবনা, করণীয় কাজ, সকলই মানুষের প্রয়োজনে চালিত হইতেছে। মূলতঃ এ সকলই ভিত্তিহীন। নিজেকে বিজ্ঞ জ্ঞানী প্রমাণ করিতে হইলে, তাহারা শাস্ত্রের বিধান উল্লেখ করে। শাস্ত্রের স্রষ্টারা একরকম নিরুপায়। তাহারাও জানে, মানুষের জীবন হইতে শাস্ত্র বড় নহে। তথাপি, মানুষের জীবনকে একটি নির্ধারিত পথে চালিত করার জন্য তাহারা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ শাস্ত্রের নির্ধারিত পথে মানুষের বাস্তব জীবন চালিত হয় না। উভয়ের মধ্যে গভীর অসংগতি রহিয়াছে। সেই অসংগতিকে সংগত প্রমাণ করিবার জন্য নানা কূট তর্কজালে আরও অজস্র অসংগতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। যথা, প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিতেছে, নাস্তিক ব্যক্তির শাস্ত্র রচনা যদি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হয়, তবে তাহা তাহার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। নাস্তিকের পূর্বজন্মই বা কী, পরজন্মই বা কী। নাস্তিক জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। নাস্তিকের শাস্ত্র আস্তিকের নিকট কী রূপেই বা উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে। বাস্তবে, ক্ষেত্রবিশেষে নাস্তিকের প্রিয়তা প্রভাব অস্বীকার করার উপায় থাকে না। অতএব নাস্তিকের শাস্ত্রকে উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। যুক্তি সিদ্ধান্তে পূর্বজন্মের সুকৃতির কথা বলিতে হয়। ইহাও মিথ্যাচারিতা।

'অসহায় মানুষ বাঁচিবার জন্য সমাজ সংসারের মঙ্গলের জন্য কিছু অবলম্বন করিতে চাহে। শাস্ত্রের অনুশাসন সেই অবলম্বন। কিন্তু অনুশাসন প্রকৃতপক্ষে ভাগ্য নিয়ন্তা নিয়তির রূপ লইয়াছে। শাস্ত্রশাসনবিধির সঙ্গে জীবন যাপনের প্রত্যক্ষ অসংগতি লক্ষ করা সত্ত্বেও মানুষ সেই নিয়তি নির্দিষ্ট বন্দিদশায় জীবন কাটাইতেছে। বহুকালের বিশ্বাস, অপরিসীম সারল্য, গভীর অজ্ঞতা, সমাজের ভয় তাহার মনে এক অলৌকিক ও সম্মোহিত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পায় না। শাস্ত্রকারেরা প্রয়োজন বোধে শাস্ত্রকে ঢালিয়া সাজায়। ইহা তাহাদের ব্যবসায়ের স্বার্থের কারণ। সে ইহাকে মুক্তির উপায় বলে। মানুষ আরও কঠিন পাশে বন্দী হয়।

'শাস্ত্রানুশাসন নিয়তির স্থান লইলেই তাহা নিমিত্ত মাত্র। শাস্ত্রকার স্বয়ং নিয়তির অধীন। নিয়তি এক ভিন্ন শক্তি। ইহা বিশ্বাস করিলে মানিতে হয়, নিয়তি অলক্ষ্যে থাকিয়া, মানুষকে তাহার ক্রীড়নকরূপে চালিত করিতেছে। তাহার শক্তি অমোঘ! মানুষ জন্ম লইতেছে। নিয়তি তাহাকে চালনা করিতেছে। হায়! মানুষ কী অসহায়! এই বোধ মনে আসিলে, অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ক্রোধ জাগিয়া ওঠে। সংসার ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্য ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া হতমান জীবনযাপনের পরিবর্তে নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা শ্রেয়ঃ। পুরাণে দুর্বাসা মুনির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কত দূর সত্য, আমি জানি না। কিন্তু নিয়তির বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামকে আমি শ্রদ্ধা করি। মানুষ হইয়া জন্মাইলাম, অথচ আমি অপরের

হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ইহা যেন জীবন্তে নিজেরই মৃত্যুশোকের মত নিদারুণ। তবে জন্মিলাম কেন। জীবজগতের নিয়মানুসারে যদি জন্ম হইল, তবে মানুষ হইয়া জন্মাইলাম কেন। পশু হইয়া জন্মাইলে এই সব চিন্তা আসিত না। ভাবিলে অন্তর অস্থির হইয়া ওঠে। ক্রীড়নক জীবনের অসহায়তার কী বিড়ম্বনা। কী কষ্ট, কী যন্ত্রণা। ইহাকে মাথা নত করিয়া মানিয়া লইবার পরিবর্তে আমার অন্তরে তীব্র বিক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। পাপ পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত বোধ, জ্ঞান বিবেক এ সকলই তবে বৃথা। তাহা হইলে কী চোখে জগতকে দেখিব। আমি জগতের কাছে অবাঞ্ছিত অথবা জগৎ আমার কাছে অবাঞ্ছিত, কোনটি সত্য। বোধ হয় উভয়ই সত্য। ভাবিলে ভয়ংকর মনে হইবে। জীবন সংসার ভয়ংকর ব্যতীত আর কী। সেই ভয়ংকরতার মধ্যেই আমি আমার জীবনকে দেখিয়াছি।

'অতএব, অদ্য জীবন বৃত্তান্ত রচনা করিতে বসিয়া মঙ্গলাচরণের কোন প্রয়োজন দেখি না। শাস্ত্রে বলে অষ্টমে নিধন স্থান। ভাল কথা। অষ্টম তিথিকেই সেইজন্য উপযুক্ত ভাবিয়া শুরু করিতেছি। ষোল শ চুরানব্বুই শকাব্দে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমীতে জন্মিয়াছিলাম। (তিথিকেই বিশেষভাবে গণ্য করা হতো।) অতঃপরেই রাশি লগ্ন ইত্যাদির বিষয় অনিবার্য হইয়া ওঠে। কিন্তু আমি সে-সব বিবরণ হইতে বিরত থাকিতেছি। কারণ জ্যোতিষী শাস্ত্রে আমার জন্মলগ্নে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল, জীবনের একটা সময়ে আসিয়া সকলই মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। পুরুষানুক্রমে বংশপরিচয়ও লিখিতে চাহি না। কেবল নিজের নামটি উল্লেখ করিব। শুনিয়াছি আমার রাশ্যাশ্রিত (অন্নপ্রাশনের দিন) নাম ছিল রমাকান্ত। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে সেই সময়ে যে রাশিতে রকারাদি নাম নির্বাচিত হওয়া উচিত, সেই রাশিতে নাকি আমার জন্ম হয় নাই। একদা এই সব বিষয়ে বিশ্বাস ছিল। এখন নাই! অতএব কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পিতামহ আমার নাম রাখিয়াছিলেন বৈদূর্য্যকান্তি। কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয়বংশ বা বন্দ্যঘটি রাঢ়ী মহাকুলীন। এসব বিবরণও আমার কাছে এখন অর্থহীন। কুল মেল জাতি পাতি সবই বিসর্জন দিয়াছি। আমার জাত পাত কিছুই নাই।

'বৈদূর্য্যমণির বিষয়ে দ্রৌপদীর গাত্রবর্ণের কথা মনে পড়ে। বৈদূর্য্যমণি (ক্যাটসআই) দেখিয়াছি। সর্পদংশনের আশংকায় জ্যোতিষের বিধানে আমাকে সোনার আংটিতে বৈদূর্য্যমণি ধারণ করিতে হইয়াছিল। তখন আমার বয়স একুশ। এখন নিতান্তই হাস্যকর বোধ হয়। ঘন দূর্বাঘাসে শিশিরবিন্দুর মত ইহার রঙ। কাহারও গায়ের বর্ণ কি এরূপ হইতে পারে। এই বর্ণের কথা শুনিয়া দ্রৌপদীর রূপ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আমার গায়ের রঙ কালো অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। বৈদূর্য্যকান্তি রায় (নবাবী উপাধি) বা বন্দ্য না। নাম হইতে শুরু করিয়া জীবনের সব কিছুতেই অমিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠরা আমাকে বেদো নামে সম্বোধন করিত। বৈদূর্য্যকান্তি রায় (নবাবী উপাধি) বা বন্দ্য বা বেদো নাম ভুলিয়াছি। আমি এখন কেবল রমাকান্ত হইয়াছি। রাশ্যাশ্রিত নাম (অন্ন-

প্রাশনে রাশি নাম) রাখিতে নাই, ইহাতে সন্তানের অমঙ্গল। বলিয়াছি, আমার মঙ্গলামঙ্গলে বিশ্বাস নাই। বরং অমঙ্গলকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব রমাকান্ত নামেই বা আর অধিক কী অমঙ্গল হইবে। কিন্তু আপাততঃ জীবন বৃত্তান্তের রচনায় আমি শৈশবকাল হইতে শুরু করিতে চাহি না। তিন বৎসর পূর্বে, সেই ভয়ংকর দিনটি হইতে শুরু করিব। অদ্য এইখানে ইতি।'



'মনে হইল আমি স্বপ্নের মধ্যে বহু ঢাকের বাদ্যাদি শুনিতেছি। তাহার সঙ্গে কাঁসরের শব্দ। এত ঢাক এক সঙ্গে বাজিতেছে, যেন ভূমি ও আকাশ কাঁপিতেছে। ঢাক কাঁসরে জগঝম্পের মধ্যে বহু লোকের উল্লসিত চিৎকার। কতক্ষণ এইরকম শুনিলাম, হিসাব নাই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন ডুবিয়া গেল। কতক্ষণ ঘুমাইলাম জানি না। আবার সেই ঢাকের প্রলয় শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল মানুষের কোলাহলে কানের পর্দা ফাটিয়া যাইবে। স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম, বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, জয় জগত্তারিণীর জয়। জয় মা মনসার জয়। জয় বিষহরির জয়।

'এই সব জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গ্রামের জগত্তারিণীর মন্দির দেখিতে পাইলাম। মনসাকেই আমাদের গ্রামে জগত্তারিণী বলা হয়। দেখিলাম শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন মনসা পূজা উপলক্ষে ঝম্পন (ঝাপান) হইতেছে। মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠের সামনে বিস্তর রক্ত। মনসা পূজা উপলক্ষে বলি হইয়া থাকে। দেখিলাম, বলি শেষ হইয়া গিয়াছে। হাড়িকাঠের সামনে ছাড়াও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রক্তের ছড়া। মন্দিরের একটু দূরেই দুই-তিনটি বাঁশের মঞ্চ তৈরি হইয়াছে। আমাদের গ্রামের এবং আশেপাশের অন্য গ্রামের যত মাল গুণীন ওঝা তাহাদের বিস্তর সাপের ঝাঁপি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঝাঁপি হইতে নানারকমের বিষধর সাপ বাহির করিয়া তাহারা নানারকম খেলা দেখাইতেছে। মঞ্চের ওপর উঠিয়া বিশেষ বিশেষ গুণীন মাল ওঝারা মাথায় দুধ গোখরার পাগড়ি বাঁধিতেছে। কালনাগিনীকে বলয় করিতেছে। শঙ্খচূড়, কালি গোখরা, খরিশ গোখরা, অতি ভয়ংকর সব বিষাক্ত সাপ দিয়া গলায় কোমরে জড়াইতেছে। দু হাতেও তাহাদের নানারকম সাপ ফণা তুলিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ যেরূপ সারা গায়ে মাথায় নানা অলংকার জড়ায়, তাহারা সেইরূপ সাপের দ্বারা সাজিতেছে।

'বহু ঢাকের শব্দে ফোঁস ফোঁস শুনা যাইতেছে না। মঞ্চ ঘিরিয়া শত শত নরনারী বালক বালিকা। কেবল মাল ওঝাদের হুংকার মাঝে মাঝে ঢাকের শব্দ ছাপাইয়া উঠিতেছে। কার কত প্রকার সাপ আছে, কে কেমন সাজিতে পারে, ইহা প্রদর্শনের পর সাপ লইয়া মঞ্চে মঞ্চে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা চলিতে লাগিল। ইহাতে

কোন সাপ হঠাৎ মঞ্চ হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ মালবৈদ্য ওঝাদের শিষ্যরা ছুটিয়া গিয়া সাপ ধরিয়া আনিতেছে। কেহ সাপের মুখে চুম্বন করিতেছে। কেহ বা শিথিল সাপকে আঘাত করিয়া তাহার ফণা উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া সেই ফণা মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে ও বাহির করিতেছে। ইহা দেখিয়া যুবতী বধূদের চোখে দ্যুতি ফুটিয়া উঠিতেছে। সলজ্জ হাসিতে পরস্পরের গায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে। পুরুষেরাও হাসিতেছে, এবং কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছে, তরুণী ভার্যার বৃদ্ধ স্বামীরা চাহিয়া দেখ। কোন কোন বৃদ্ধ বলিয়া উঠিতেছে, আমার ফণা যথেষ্ট শক্ত আছে, সূক্ষ্ম ছিদ্রেও প্রবেশ করিতে পারে।

'অতঃপর সকলেই এমন সব অশ্লীল কথাবার্তা আরম্ভ করিল, গৃহস্থ রমণীরা হাসিতে হাসিতে দ্রুত গৃহে গমন করিল। কিন্তু হাড়ি ডোম বাগদি, মাল ওঝাদের স্ত্রীগণ স্থান ত্যাগ করিল না। বরং নির্লজ্জ উল্লাসে হাসিতে হাসিতে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া অতি কদর্য আচরণ করিতে লাগিল। তাহারা এমন সব অশ্লীল কথা বিনিময় করিতে লাগিল, পুরুষদেরও অতিক্রম করিয়া গেল। হাড়ি ডোম স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সুরা পান করিয়া আসিয়াছে, ইহা সকলেই জানে। সকলে মহানন্দে তাহা শুনিতে ও দেখিতে লাগিল। কিন্তু মাল ওঝাদের সাপ লইয়া খেলা দেখিতে দেখিতে আমার শরীরে বড় অস্বস্তি বোধ হইল।

'পূর্বে এরূপ হইত না। একুশ বৎসর বয়সে সর্পদংশনের ভয়ে যখন হইতে আমাকে বৈদূর্যমণি ধারণ করিতে হইয়াছিল, তখন হইতে সাপ দেখিলেই আমার শরীরে একপ্রকার অস্বস্তি হইত। জ্যোতিষীতে তখন আমার বিশ্বাস এমন বদ্ধমূল ছিল, সময়ে রজ্জুতেও সর্পভ্রম হইত। আমি গলায় শব্দ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উঠিলাম। তৎক্ষণাৎ সেই স্বপ্ন দূর হইয়া গেল। একটা তন্দ্রার ঘোরে আবিষ্ট হইয়া রহিলাম। আমি অস্পষ্ট স্বর শুনিতে পাইলাম, কী মহাপাতক! ইহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে।

'পুরুষের কণ্ঠস্বর, অস্পষ্ট হইলেও শুনিতে পাইলাম। কে বলিল, কেন বলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তন্দ্রার ঘোরের মধ্যেই স্বপ্নবৎ বহু লোকের নানা কথাবার্তা আমার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বুঝিতে পারিতেছি না, আমি কোথায়, কী অবস্থায় আছি। এখনও কি সেই জগত্তারিণীর ঝাপানের কোলাহল শুনিতেছি! কিন্তু তাহা বোধ হইতেছে না। এ কোলাহল অন্যরকম। ইহা সমবেত কোলাহল নহে। অথচ চারিপাশে নানালোকের নানা কথা শুনা যাইতেছে। একবার মনে হইল, বাড়ির মধ্যে কোন শুভ যাগ কর্ম হইতেছে। অতিথি নিমন্ত্রিতের দল নানা কথা ও হাস্য পরিহাস করিতেছে। ইহা মনে হইবার কারণ, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরও আমার কানে আসিতেছে। শুনিতেছি, অথচ সম্যকরূপে কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। সমস্তই একটা তন্দ্রার ঘোরে শুনিতেছি। এই সময়ে কেহ যেন আমার ঠোঁট ফাঁক করিয়া ধরিল এবং মুখের মধ্যে কোন কাদার মতো কটু অম্ল জল ঢালিয়া দিল। আমি তাহা গিলিতে পারিলাম না। থুৎকারে

বাহিরে ঠেলিয়া দিলাম। অনুভব করিলাম আমার ঠোঁটের কষ ও চিবুক দিয়া তাহা গড়াইয়া পড়িল। এইবার আরও স্পষ্ট পুরুষের স্বর শুনিতে পাইলাম কী মহাপাপ, দেখ ইহার পূর্ণজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে।

'কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত মনে হইল। কিন্তু যথার্থ চিনিতে পারিলাম না। আবার আমার ঠোঁট ফাঁক করিয়া সেই কটু অম্ল পদার্থ দেওয়া হইল। এইবার বুঝিলাম অম্ল ও কটু স্বাদের দধি আমার মুখে দেওয়া হইতেছে। আমি আবার থুৎকারে তাহা মুখের বাহিরে ফেলিয়া দিলাম।

'আমার নিজের স্খলিত বিরক্ত স্বর শুনিতে পাইলাম। মুখ মুছিবার জন্য হাত তুলিতে চেষ্টা করিলাম। হাত উঠিল। মুখের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু আর নাড়িতে পারিলাম না। এই সময়ে অন্য এক পুরুষের স্বর শুনিতে পাইলাম, কী দুর্ভাগ্য। জানি না কী ঘটিবে।

'ইহার জবাবে পূর্বের স্বর শুনিতে পাইলাম, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। যে যেমন ভাগ্য লইয়া জন্মাইয়াছে, তাহা খণ্ডন করা যায় না। বয়স বেশি হইলে জলে নামাইয়া দিতাম। ইহাকে তাহা করা সম্ভব নহে। এই সব কথা শুনিয়া আমার তন্দ্রাবিষ্ট ঘোর ক্রমে দূর হইয়া গেল। কথাগুলির অর্থ যেন আমার কাছে স্পষ্ট বোধ হইল। আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে এক অশুভ ভয়ংকর সংকেত পাইলাম। বিশেষ করিয়া বয়স বেশি হইলে জলে নামাইয়া দিবার কথায়, ভয়ংকর সংকেতটি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। চোখ না মেলিয়াও নির্ঘাৎ বুঝিলাম আমি গঙ্গাযাত্রীর ঘাটে শায়িত রহিয়াছি। বৈদ্যেরা নিশ্চিত নিদান দেওয়ায়, আমাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া আসা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা ত্রিবেণীর ঘাট। যে সমস্ত কোলাহল শুনিতেছি, তাহা স্নানার্থী এবং মাঝিমাল্লাদের। হরিধ্বনিও কানে আসিল। নিকটের শ্মশানের চিত্র আমার চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। নানা গন্ধের মধ্যে মৃতদেহের দগ্ধ গন্ধও এখন স্পষ্ট পাইতেছি। অভিজ্ঞতা নতুন নহে। আমার পিতামহকে এই ঘাটেই অন্তর্জলি যাত্রার জন্য লইয়া আসিয়াছিলাম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পাঁচদিন বাঁচিয়াছিলেন। আমার চার জ্যাঠাইমার মধ্যে একজনকে এই ঘাটে আনিয়াছিলাম। তাঁহাকে অন্তর্জলি করিতে হয় নাই। মাত্র দুই দিন বাঁচিয়া প্রচুর গঙ্গাজল পান করিতে করিতে মরিয়াছিলেন। তাঁহার মুখেও অম্ল কটু দই দেওয়া হইয়াছিল। জ্যাঠামশাই অনেক আগেই মারা গিয়াছিলেন। তখন আমার বার বছর (১৭৮৪ খৃঃ) বয়স। তাঁহাকে ত্রিবেণীতে আনা হয় নাই। সপ্তগ্রামে ছোট গঙ্গার তীরে (মূলত সরস্বতী নদী) তাঁহার জন্য একটি চালাঘর করা হইয়াছিল। ইহার কারণ পরে বুঝিয়াছিলাম। আমার জ্যাঠামহাশয়ের চার পত্নীর মধ্যে, প্রথমা তাঁহার সঙ্গে সহমরণে চিতারোহণ করিয়াছিলেন। পাছে কোম্পানির সাহেবরা আসিয়া বাধা দেয়, সেই জন্যই সাতগাঁয়ে দাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জ্যাঠাইমার সেই লাল চেলি পরা, সধবা মূর্তি এখনও আমার চোখে ভাসে। ইহাও মনে আছে, তাঁহাকে সহমরণে যাইতে কেহ কোনরূপ উদ্বুদ্ধ করে নাই। তিনি স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। জ্যাঠাইমার 'সতী'

ইবার সংবাদ গোটা পরগণায় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সেই সহমরণ দেখিবার জন্য দোল দুর্গোৎসব ঝাপানের অপেক্ষাও বেশি লোক সমাগম হইয়াছিল।

'আমি পরেও দুইটি সহমরণ দেখিয়াছি। তাহা ছিল হত্যারই সামিল। যে বিধবা জ্যেঠাইমাকে এই গঙ্গাযাত্রীর ঘাটে আনা হইয়াছিল, তিনি গঙ্গাজল আর অম্ল দই খাইয়া সজ্ঞানে মরিয়াছিলেন। মনে আছে, তিনি মুখে গঙ্গা জল ও কটু দই নিতে পারিতেছিলেন না। জোর করিয়াই তাঁহাকে কর্দমাক্ত গঙ্গাজল ও কটু দই দেওয়া হইয়াছিল। আজ আমার মুখেও অম্ল কটু দই দিবার চেষ্টা হইতেছে। যাহারা কথা বলিতেছে, কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাদের চিনিতে পারিতেছি। আমার কনিষ্ঠ ভাই শ্যামকান্তি এবং জ্ঞাতি খুড়া ভবতারণ বন্দ্য ভট্টাচার্য। আর কোন সন্দেহ নাই আমি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে শায়িত রহিয়াছি। মাঝিমাল্লাদের হাঁকডাক, স্নানার্থীদের কলকোলাহল, শ্মশানযাত্রীদের হরিধ্বনি, ত্রিবেণীর এই সবই আমার পরিচিত। এখন আমাকে মারিবার চেষ্টা হইতেছে। জ্ঞাতি খুড়া ভবতারণ, নিতান্ত আমার বয়সের কথা ভাবিয়া গঙ্গার জলে নামাইতে পারিতেছে না। শ্যামকান্তির স্বর অশুভ ভয়ে আক্রান্ত। আমার চারিপাশে অনেকের ফিসফাস শুনিতেছি। যেন প্রেতাত্মারা বায়ুর সঙ্গে কথা বলিতেছে। বুঝিতেছি, কেবল জ্ঞাতি খুড়া ও আমার কনিষ্ঠ ভাই আসে নাই। আত্মীয়বর্গের আরও কেহ কেহ আসিয়াছে। তাহারা ভৌতিক স্বরে নানা কথা আলোচনা করিতেছে। তাহাদের কথা আমি স্পষ্ট কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। কিন্তু না শুনিতে পাইলেও, কী আলোচনা হইতেছে তাহার মর্মার্থ আমি জানি।

'আমার বাঁচিয়া থাকা তাহাদের কাছে কোন প্রকারেই প্রার্থিত নহে। আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত ছিল। প্রত্যক্ষ না জানিলেও ইহা নিশ্চিত, বৈদ্য আমার নিদান (অনিবার্য মৃত্যু) ঘোষণা করিয়াছিল। সেই কারণেই সুদূর গ্রাম হইতে আমাকে নৌকাযোগে এখানে আনা হইয়াছে। আমি নিজেও জানি না, কত দিন আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। আজ কিছুক্ষণ আগেই যে প্রথম তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তাহা নহে। ইতিপূর্বেও দুই চারিবার এরূপ অঙ্কিত স্বপ্নের ক্ষীণ রেখা আমার ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা ছিল নিঃশব্দ অথচ জীবন্ত চিত্রের মত। কিছু শুনিতে পাই নাই। কোন অনুভূতিও ছিল না। এখন আমার শরীরে অনুভূতি ফিরিয়া আসিতেছে। কথা শুনিতে পাইতেছি। জিভে স্বাদ পাইতেছি। হাত নাড়িতে পারিতেছি। ডান হাত এখন আমার মুখের ওপর রহিয়াছে, যাহাতে কিছু মুখে দিতে গেলে বাধা দিতে পারি। এমন কি ইহাও অনুভব করিতেছি, আমার হাতে অনধিক এক সপ্তাহকালের গোঁফ দাড়ির স্পর্শ।

'ইহা আমারই দুর্ভাগ্য অথবা ভাই জ্ঞাতি খুড়া ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ পুরুষদেরই দুর্ভাগ্য। বৈদ্যের নিদান ব্যর্থ হইয়াছে। আমার দুর্ভাগ্য, এখন পরিপূর্ণ মাত্রায় বাঁচিয়া রহিয়াছি। আমাকে লইয়া যাহারা গঙ্গাযাত্রায় আসিয়াছে তাহাদেরও দুর্ভাগ্য। তাহারা আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে। তাহাদের পক্ষে

ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবাত্মার কী মহিমা, আমার বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছে আমার নিশ্চিত অনুমান, আমাকে যাহারা লইয়া আসিয়াছে, তাহারা এক অশু আশংকায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অবস্থায় পড়িলে আমার মনে অবস্থা কি তাহাদের মতই হইত না! আমি জানি, এখন তাহাদের আলোচন বিষয় একটি। আমাকে রাখিবে অথবা মারিবে। এই সময়েই আমি একজন পুরুষে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে শুনিলাম। বলিতে শুনিলাম, হে বাবাঠাকুরেরা, এম কাজ করিও না। ইহাতে আমার ব্রহ্মশাপ লাগিবে।'...



তাপস পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে, খাতা থেকে মুখ তুলল। দেখলো অব ফিরে এসেছে। তাপসের নিজেরও খেয়াল ছিল না ও কখন গায়ের জামা খু ফেলেছে। ও উপুড় হয়ে গভীর মগ্নতায় পাণ্ডুলিপির প্রতিটি লাইন অনু করছিল। গভীর মগ্নতার মধ্যে একটা উত্তেজনাও রয়েছে। ও খালি গায়ে ঘামছে। অথচ পশ্চিমের পাল্লাহীন খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে হাও আসছে। ও অকুরকে দেখে সোজা হয়ে বসলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো চা দিকে এখনও ঝা ঝা রোদ। ঘোর দুপুরবেলা দুটো আড়াইটার বেশি না। অ ও জানতো অকুর বিকালের আগে ফিরবে না। অকুর নিজেও তা-ই বলে গিয়েছিল

অকুরকে দু কাঁধে ঝোলাঝুলি নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে তাপস সোজা হ বসলো। দীর্ঘকাল টেবিল চেয়ারে বসে লেখার অভ্যাস। সোজা হয়ে বসতে গি ওর কোমর টনটন করে উঠলো। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখনই ফি এলে? বলেছিলে ফিরতে ফিরতে বেলা পড়ে বিকেল হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, তাই ত বলেচিলুম গো দাদাবাবু।' অকুর ক্লান্ত ঝুঁকে পড়ে নিজে কোণটিতে যেতে যেতে বললো, 'তা পরে বাইরে যেয়ে মনে হল, তুমি বা ভদ্দরলোকের ঘরের ছেলে। আমার মতন একবেলা খেয়ে থাকবে কেমন করে। ত ভেবে তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম। ভিখ মাগার কাজটা তেমন হল না। বাজার থে এ দোকান ও দোকান ঘুরে কিছু কেনাকাটা করে চলে এলুম। আলু কুমড়ো এনেচি, ভাতে ভাত ফুটতে সময় লাগবে না।' সে কথা বলতে বলতে ঘাড়ের ঝো নামালো। কপালের গংগা মাটির ফোঁটাটা ঘামে নাক অবধি গড়িয়ে এসেছে।

দুপুরবেলা খাওয়ার কথাটা তাপসেরও খেয়াল ছিল না। এখনও ওর ম পাণ্ডুলিপির মধ্যে ডুবে আছে। বললো, 'আমার জন্য তোমার ফিরে আস দরকার ছিল না। তোমার সংগে তোমার মতোই থাকবো। তুমি যদি সারাদি একবার খেয়ে থাকতে পারো, আমিও পারবো। আমার জন্য তোমার দুপু রান্না না করলেও চলবে।'

'তা কি হয় বাবা।' অকুরের গোঁফ দাড়ির ফাঁকে তার দাঁতহীন লাল মাড়ির হাসি দেখা গেল, 'বাবু ভদ্দরনোকের ছেলে নয় বাদ দিলুম। তোমার বয়সটা দেখতে হবে ত। জোয়ান ছেলে, এ বয়সে কি একবেলা খেয়ে থাকা যায়? ভিখ মাগতে যেয়ে, আমিও দোকান থেকে চেয়ে চিন্তে যা পাই, এক মুঠো চিড়ে মুড়ি গুড় চিবিয়ে জল খাই। বুড়ো হলেও পেট মানে না। তোমার মতন বয়সে আমি কি একবেলা খেয়ে থেকেচি?' সে তাপসের দিকে এগিয়ে এসে একটা ঠোঙা বাড়িয়ে দিল, বললো, 'নাও তোমার পয়সা দিয়েই মুড়িমুড়কি মিশিয়ে কিনে এনেচি। চিবও, আমি উনোন জেবলে ভাত বসিয়ে দিচ্ছি।'

তাপস বৃদ্ধ অকুরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। অবাস্তব কথা সে বলেনি। এই ভাঙ্গা গঙ্গাযাত্রীর ঘরের নিভৃত জীবনে, ভিক্ষে করে জীবন-ধারণ করলেও সংসার ও মানুষ সম্পর্কে তার বাস্তব চিন্তা-ভাবনা নষ্ট হয়নি। তাপস ঠোঙ্গাটা হাতে নিতেই, মুড়ি মুড়কির গন্ধে ওর খিদে পেয়ে গেল। অকুরের দিকে তাকিয়ে হেসে ঠোঙ্গা থেকে মুড়ি মুড়কি নিয়ে মুখে দিল। অকুর বললো, 'দেখ, যার যেমন জীবন। আমি গেচি ভিখ্ মাগতে আর তুমি এক মনে নেকাপড়া করচ। এটাই বুইতে পারলুম না ঘর ছেড়ে এ ঘাটে এসে কেন বাবা নেকাপড়া নিয়ে বসেচ।'

তাপস হাসতে হাসতে আরও কয়েক মুঠো মুড়ি মুড়কি মুখে পুরলো। অকুরেরও কোনো জবাবের প্রত্যাশা নেই। সে নিজের জায়গায় সরে গিয়ে, ঝোলা থেকে কলাপাতা বের করে বললো, 'তোমার জন্যে কলাপাতা নিয়ে এসিচি। আমার বাসনপত্তরে তোমাকে খেতে দিতে পারব না। যা বল কও বাবা, পিবিত্তি বলে একটা কথা আছে। যদি বল, কাল তোমার জন্যে একটা আলাদা মাটির হাঁড়ি কিনে নিয়ে আসব।'

'কোনো দরকার নেই অকুরদা।' তাপস এই প্রথম অকুরকে একটা নামে সম্বোধন করলো, 'তোমার হাঁড়ি থালা বাসনে খেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমার তো সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

অকুর মালসায় চাল ঢালতে ঢালতে বললো, 'তা হোক বাবা, তুমি আমি এক নই। পেথমে ত ভেবেচিলুম আমাকে তুমি মারতে এসেচ। তা যখন আসনি, আমার সঙ্গে থাকবে বলচ, আমাকে আমার মতন সব করতে হবে।' কলসী গড়িয়ে চালের মালসায় জল নিয়ে আবার বললো, 'তা ছাড়া, বিকেল লাগাদ আমি একবার কাট-কুটো পাতা ঝোরা কুড়তে যাব। আজ দু বেলা রাঁধব। রাতের ভাত তোমার জন্যে জল দিয়ে রেখে আমি সকালে বেরিয়ে যাব। তেল এনিচি। আলু প্যাঁজ কুমড়ো ভেজে রেখে যাব। দুপুরে যখন খিদে পাবে, তাই খাবে।' সে কলসী থেকে একটা টিনের কৌটায় জল ঢেলে গঙ্গার দিকে খোলা দরজার কাছে গেল। দু হাত ধুয়ে, গোঁফ দাড়ি ভিজিয়ে চোখে মুখে জল দিল। তারপরে ফিরে এসে, মালসার চালে হাত দিল। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'তোমার মোমবাতি এনিচি, দেশলাই এনিচি, সিরগেটও এনিচি। সব দিচ্ছি। ভাতটা আগে বসিয়ে দিই। তোমার যখন

সময় হবে তখন হিসেব দেব। এখন লেকাপড়া করতে চাও ত কর।'

তাপস অকুরকে যতোই দেখছিল, ওর কথা শুনছিল, ততই অবাক হচ্ছিল। তার কথায় কাজে কোনো ত্রুটি নেই। বাড়াবাড়ি নেই। আপাতদৃষ্টিতে সে যেন নির্লিপ্ত, অথচ বাস্তববোধের কোনো অভাব নেই। একদা সে গরীব কৃষক ছিল। যখন তার কাজের ক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়েছিল, তখন সে ছেলেদের একটা বোঝা মাত্র। তারা তাকে খেতে দিতে পারেনি। কিন্তু বাঁচতে বড় সাধ, মরতে কেউ চায় না। সেই কারণে সে সংসারের বাইরে, ভিক্ষে করে বেঁচে আছে। তার কোনো অভিযোগ নেই। সে ছেলেদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেনি। সমাজ সংসারের বিরুদ্ধেও এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করেনি। অথচ সংসারের বোধ বুদ্ধি হারায়নি। জীবনকে সে এইভাবে মেনে নিল কেমন করে। তাপসের অভিজ্ঞতায় এমন চরিত্র দরিদ্র কৃষকের সঙ্গে মেলে না। সে সংসার অভিজ্ঞ, অথচ সংসারের বাইরে সে যেন একাকী এক দার্শনিক। সে নিজেকে নিতান্ত ভিখিরি ভাবে না. তাকে দেখেও একটা ছন্নছাড়া ধূলামলিন ভিখিরি মনে হয় না। স্থান কাল পাত্র এবং নিজের সম্পর্কে সে অবহিত। এক রাত্রের পরে এই দুপুরে লোকটিকে ওর আরও ভালো লাগলো। এই বহিষ্কৃত জীবনে, অকুরের প্রতি ও কৃতজ্ঞবোধ করলো। তার কথায় ওর ক্ষণিকের অন্যমনস্ক মন আবার পাণ্ডুলিপির দিকে ফিরে গেল।



বিকাল আসন্ন। অকুর কাটকুটোর সন্ধানে বেরিয়েছে। ভাদ্রের দীর্ঘদিন। আসন্ন বিকালেও মনে হচ্ছে ঘোর দুপুর। তাপস নিজের কাজে ডুবে গিয়েছে।...

'রুদ্ধ কান্নার সঙ্গে পুরুষের এই উৎকণ্ঠিত স্বর শুনিবা মাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলাম। এই স্বর দুযা বাগ্দির। অর্থাৎ দুর্যোধন বাগ্দির। স্বর চিনিবামাত্র, আমার অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব মুহূর্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। দুযা আমার পাইক সর্দার। তাহার সঙ্গে আমার এক প্রকার সখ্যতা ছিল। আমার পশ্চিমের বড় পুষ্করিণীর ধারে বাগানে একটি আখড়া করিয়াছিলাম। সেখানে প্রায় অপরাহ্ণেই তাহার সঙ্গে আমি মল্লক্রীড়া (কুস্তি) করিতাম। দুযা আমারই বয়সী হইবে। বংশপরম্পরায় উহারা নবাব সরকারের অধীনে যুদ্ধ করিত। তিন পুরুষ আগেই তাহাদের যুদ্ধবৃত্তির যুগ শেষ হইয়াছে। দুযাই একমাত্র আমার অধীনে চাকরি করিত। উহার বাপ জ্যাঠারা আমাদের ভূমিতে কৃষিবৃত্তি করিত। দুযা ছাড়াও আমার আরও কয়েকজন পাইক ছিল। তাহারাও সকলেই বাগ্দি। ভিন্ন পরগণায় রাজস্ব আদায়ের সময় তাহারা আমার সঙ্গে যাইত। সরকারে জমা দিবার সময়ও যাইত।

'অবকাশ সময়ে ঘরে স্ত্রীলোকদের বা বাইরের বাড়িতে বয়স্যগণের সঙ্গে কেবল পাশা সটকা (?) খেলিতে আমার ভাল লাগিত না। শরীর চর্চার দিকে আমার ঝোঁক ছিল। দুঃখের বিষয় পরিবারের বা জ্ঞাতিবর্গের যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চার কোন উৎসাহ ছিল না। দুযার সেই উৎসাহ ছিল। তাহার রাঁয়বেশ খেলা দেখিবার মত ছিল। আমিও তাহার সঙ্গে খেলিতাম। তবে আমাদের উভয়েরই বয়স চল্লিশ হইয়াছিল। অল্প বয়সের উদ্দামতা তেমন ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝেই বাগানের মল্লভূমিতে যাইতাম। যেদিন লড়াই হইত না, সেইদিন দুযা কেবল আমার শরীর দলন মর্দন করিত। এ কথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, মেদবর্জিত শরীরে আমি বিশ বছরের যুবকের মত শক্তিশালী বোধ করিতাম।

'দুযাও বয়স অনুপাতে অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ছিল। দৈর্ঘ্যে সে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হইলেও, প্রস্থে ভীমের মত চওড়া ছিল। রং ভ্রমরের মত কালো উজ্জ্বল। চল্লিশ বছর বয়সে আমাকে সকলে যেমন তরুণ দেখিত দুযাকেও সেইরকম দেখিত। শরীর চর্চার বিষয়টি আমার পিতামহর কাছ হইতে পাইয়াছিলাম। তিনি নিজে কৈশোর ও যৌবনে ব্যায়ামাদি করিতেন। আমার পিতার সে উৎসাহ কখনও দেখি নাই। পিতামহ যৌবনে বুকে আছড়াইয়া কাঁচা বেল ভাঙিতে পারিতেন। দু হাতে সর্ষে চটকাইয়া তেল নিষ্কাশন করিতে পারিতেন। রাঁয়বেশেও তিনি দক্ষ ছিলেন। এ সব অধিকাংশই শুনিয়াছি। বালক বয়সে পিতামহ খেলাচ্ছলে কিছু দেখাইতেন। বলিতেন, দেশের আগের অবস্থা থাকিলে মুর্শিদাবাদে রাখিয়া দক্ষ বীরদের কাছে তিনি আমাকে ব্যায়াম শিক্ষা করিতে দিতেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক, আমার বারো বছর বয়সে আমি যখন পারসী শিখিবার জন্য দুই বছর মুর্শিদাবাদে ছিলাম, তখনই আমার শরীর চর্চা শুরু হইয়াছিল। আমার পিতামহ (নাম নেই) মুর্শিদাবাদের রাজস্ব বিভাগে চাকরি করিতেন। আমার পিতাও কিছুকাল করিয়াছিলেন। সেখানে আমি এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকিতাম। মখদমে যাইয়া পারসী শিখিবার কোন প্রশ্ন ছিল না। একজন পারসী ও আরবি ভাষার পণ্ডিত সৈয়দ ধার্মিক মুসলমানের কাছে লেখাপড়া শিখিতাম। নবাবের আত্মীয়বর্গ বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারের সন্তানরা যেখানে মল্লক্রীড়া করিত, পিতামহ আমাকে সেইখানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতার ইহাতে তেমন সম্মতি ছিল না। রাজস্ব বিভাগে কিছু কাজকর্ম চালাইবার মত শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট। পিতার আর কোন উৎসাহ ছিল না। ত্রিবেণীতে ইতিপূর্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলাম। যদিচ তাহাতে আমি তৃপ্ত ছিলাম না। পরে আমি নতুন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম।

'সে সব পরের কথা। মুর্শিদাবাদে যে ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতাম তিনি আমার পিতামহের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা ছিল না আমি মল্লভূমে যাই। পারসী শিক্ষকের গৃহ হইতে ফিরিয়া স্নান না করিয়া আমি তাঁহার গৃহে প্রবেশ

করিতাম না। মল্লক্রীড়া সারিয়া ফিরিবার পরে, দুইবার স্নান করিলে, তিনি হয়তো মনে মনে অধিক সুখী হইতেন। মুরশিদাবাদ নগরে যে সব সুবিধা ছিল, গ্রামে তাহা ছিল না। বলিয়াছি, আমাদের গ্রামের বাড়িতে কাহারও শরীর চর্চায় উৎসাহ ছিল না। অতএব দুয়াকে লইয়া আমিই পশ্চিমের বাগানে একটি চালাঘর করিয়া, তাহার মধ্যে মাটি কাটিয়া মল্লভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

'দুয়া প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল। মল্লক্রীড়া করিতে গেলে, ব্রাহ্মণের গায়ে তাহার পায়ের স্পর্শ লাগিবে, ইহা পাপ। তখন আমার পিতামহই বিধান দিয়াছিলেন দুয়া ক্রীড়ার শুরুতে আমার পদধূলি লইবে। ক্রীড়ার শেষেও পদধূলি লইবে এবং আমার পাদোদক পান করিবে। সেই হইতে দুয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অন্যরকম গড়িয়া উঠিয়াছিল। শুরুতে, অল্প বয়সে অবকাশ পাইলেই দুয়া আর আমি মল্ল ঘরে যাইতাম। বয়সের ও পারিবারিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মল্লক্রীড়া বা অন্যান্য ক্রীড়াও কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেহ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না, শরীর চর্চায় একবার অভ্যস্ত হইলে, তাহা অনেকটা নেশার মত পাইয়া বসে। কিছুদিন মল্লক্রীড়া বন্ধ থাকিলেই শরীর যেন নিস্তেজ বোধ হয়। মনে স্ফূর্তি থাকে না। সেই জন্য চল্লিশ বছর বয়সেও অবকাশ পাইলেই আমি আর দুয়া পশ্চিমের বাগানের ক্রীড়াভূমিতে যাইতাম। এইরূপ নহে যে, উহা দুইজনের একটি নিভৃত ক্ষেত্র ছিল। বিশেষ করিয়া অন্যান্য পাইক ও অল্পবয়সী কুতূহলী বালকেরা সেখানে উপস্থিত থাকিত। সময়ে যুবক বা বয়োঃজ্যেষ্ঠরাও নিতান্ত কৌতুকবশতঃ উপস্থিত হইত।

'যে মুহূর্তে আমি রুদ্ধ কান্না ও কথা শুনিয়া দুয়াকে চিনিতে পারিলাম সেই মুহূর্তেই জ্ঞান হারাইবার পূর্বের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। তখনও জানি না কতক্ষণ বা কয়দিন আমার জ্ঞান ছিল না। শেষ মনে ছিল। আমি আর দুয়া পশ্চিমের বাগানে মল্ল ঘরে গিয়াছিলাম। নিয়মিত যা হইত তাহাই হইয়াছিল। আশ্বিনের অপরাহ্ণ, তখনও শরতের নীল আকাশে রৌদ্র ছিল। দুয়া আর আমি কাপড় খুলিয়া লেঙ্গুটি পরিয়াছিলাম। দুয়া দণ্ডবত হইয়া আমাকে প্রণাম করিয়াছিল এবং মনে মনে ঠোঁট নাড়িয়া কী সব বলিয়াছিল। প্রণাম করিয়া ঠোঁট নাড়িয়া কিছু বলা নতুন নহে। আমি জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিত, বলিত কর্তাদাদা উহা শুনিয়া আপনার কাজ নাই। কিন্তু আমি জানিতাম সে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে বলিত আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া তাহার যেন কোন পাপ না লাগে। সম্ভবতঃ সে ঈশ্বরের কাছে আরও প্রার্থনা করিত ক্রীড়া যুদ্ধে যেন আমার কোনরূপ কষ্ট না হয়।

'আমি ইহা পছন্দ করিতাম না। দুয়ার মনে যদি এইরকম দ্বিধা ও ভয় থাকে তবে লড়াই ভাল হইত না। লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল সে সর্বদাই আমার নিকট পরাজয় মানিয়া লইতে চেষ্টা করিত। নিজের পরাজয়ে সে সুখী হইত। আমি বিরক্ত হইতাম। তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য নানা প্রকার গালি দিতাম। তাহার শক্তি ও বীর্য সম্পর্কে কটূক্তি করিতাম, অশ্লীল কথা বলিতাম।

এমন কি তাহার স্ত্রীর নাম লইয়া বিদ্রূপ করিতাম। দুযার স্ত্রী আমার অন্তঃপুরে থাকিয়া কাজ করিত। বাড়ির খিড়কি পুকুরের নিকটে, তাহার জন্য আমি আলাদা ঘর করিয়া দিয়াছিলাম। ক্রীড়ায় তাহাকে উত্তেজিত করার জন্য, আমি অনেক সময় তাহাকে অন্যায় আঘাত করিতাম। একেবারেই যে এ সবের কোন ফল হইত না, এমন নহে। এক এক দিন দুযা এমন রুদ্ররূপ ধারণ করিত, মনে হইত আমাকে লইয়া সে গেন্ডুয়া খেলিতেছে। দেখিতাম তাহার মধ্যে তখন সেই পূর্বপুরুষ যোদ্ধাদের ভয়াল রক্ত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ঘর্মাক্ত কালো বিশাল শরীর ও রক্তচক্ষু দেখিয়া একটা ক্ষিপ্ত বরাহের মতন মনে হইত।

'দুযার পক্ষে একটা বিষয় বোঝা সম্ভব ছিল না। ক্রীড়াতে ক্রোধ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ছিল অন্যরকম। নিজে পর্যুদস্ত হইবার জন্য আমাকে সমস্ত রকম সুযোগ দিত। অন্যথায় ক্ষিপ্ত হইয়া লড়িত। সে রুদ্র হইয়া উঠিলে তাহাকে সামলানো অসম্ভব ছিল না। কারণ তখন সে কেবল বল-প্রয়োগের চেষ্টা করিত। ক্রীড়া কৌশল ভুলিয়া যাইত। আমি কৌশলের আশ্রয় লইতাম। তথাপিও তাহাকে যথার্থ সামলানো কঠিন হইয়া পড়িত। ক্রীড়ার শেষে যখন এই সব কথা বলিতাম, সে সকাতর লজ্জায় আমার পায়ে মুখ গুঁজিয়া থাকিত।

'যখন রুদ্ধ কান্না ও কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম মনে পড়িল, ক্রীড়া শুরু হইবার পূর্বে সে আমাকে প্রণাম করিল। ঠোঁট নাড়িয়া প্রার্থনা করিল। ক্রীড়ার পূর্বেই একটি পাথর বাটিতে কাঁচা দুগ্ধ এক কোণে রাখা থাকিত। আমি আমার গলার সোনার হারের সহিত মৃত্যুঞ্জয় মাদুলি ডান হাতের বৈদূর্য-মণি ও একটি অন্য আংটি খুলিয়া সেই পাথরবাটিতে রাখিয়া দিতাম। ক্রীড়ার শেষে আবার সেগুলি ধারণ করিয়া স্নান সারিয়া কাপড় বদলাইতে অন্দরে যাইতাম। আমি প্রস্তুত হইবার পরে, দুযাও প্রস্তুত হইল। প্রথমে সে আমার গায়ে মল্লভূমির মাটি ছড়াইয়া খানিকক্ষণ দলন মর্দন করিল। ইতিমধ্যেই কুতূ-হলী কয়েকটি বালক আসিয়া জুটিয়াছে। ক্রীড়া শুরু হইল। দুইজন পাইক ও জ্ঞাতি খুড়া ভবতারণ ভট্টাচার্যও আসিল। যে ভবতারণ খুড়া এখন এখানে উপস্থিত রহিয়াছে, যাহার কণ্ঠস্বর আমি আগেই শুনিয়াছি।

'দুযা তাহার অভ্যাস মত বারে বারেই পরাজয় মানিতে লাগিল। আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া নানা কথায় উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলাম। সেও জবাবে কেবল হাসিতে লাগিল। দু একবার আক্রমণ করিয়া আমাকে পর্যুদস্তও করিল। আমিও তাহাকে আক্রমণ করিতে শুরু করিলাম। এইরূপ ক্রীড়া চলিতে চলিতে সহসা কী হইল বুঝিলাম না, বুকে একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইলাম। আমার শরীরের দৈর্ঘ্যের জন্য যেমন কিছু সুবিধা ছিল, তেমনি দুযার দৈর্ঘ্য কম হইলেও সে তাহার পাথরের মত মাথার দ্বারা প্রায়ই আমাকে ষাঁড়ের মত ঢুঁষা মারিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাহা পেটে, পিঠে ও কোমরেই মারিত। বুকে লাগিলেও, আমি সামলাইয়া লইতাম। এইদিন কী হইল

বুঝিলাম না, বুকে সহসা আঘাত পাইয়া তীক্ষ্ন ব্যথা অনুভব করিলাম। দুযা তাহা বুঝিতে পারে নাই। আমি অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছি সম্ভবতঃ এই ভাবিয়া, আবার আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমি পড়িয়া গেলাম, জ্ঞান হারাইলাম। কেবল একটি স্বর শুনিতে পাইলাম, কর্তা দাদার মুখের কষে রক্ত পড়িতেছে। তারপরে এই প্রথম জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম।

'জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া যাহা শুনিলাম, তাহা মর্মান্তিক। আমার নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াই, গঙ্গাযাত্রা করিয়া, এই ঘরে লইয়া আসিয়াছে। আমার চোখের সামনে গ্রামের বৈদ্য মুরলীধর গুপ্ত কবিরাজের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। কপালে চন্দনের ফোঁটা, টাক মাথায় পাগড়ির মত এক খণ্ড কাপড় জড়ানো। গলায় পৈতা গায়ে জড়ানো শাদা মোটা কার্পাস বস্ত্র। পাড়হীন ধুতিও সেইরকম। আমি তাঁহাকে বৈদ্য খুড়া বলিয়া ডাকিতাম। আমার প্রপিতামহের আমলে, এই বৈদ্য পরিবারকে গ্রামে বাসস্থানের ভিটা ও জমি দেওয়া হইয়াছিল। এই বৈদ্যবংশই বংশপরম্পরা গ্রামের মানুষদের ও আমাদের বাড়ির চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, মুরলীধর বৈদ্য খুড়া আমার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। ওষুধ দেওয়া ছাড়াও তিনি নানা প্রকার ঝাড়ফুঁক মন্ত্র পড়িয়া থাকেন। যখন তিনি আর কোন আশা দেখেন নাই, তখনই নিদান দিয়াছেন। নিদান দেওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

'অতঃপর বিধান অনুসারে, আমাকে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে লইয়া আসিয়াছে। কখন আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কিছুই জানি না। ভবতারণ খুড়া ভাই শ্যামকান্তি এবং দুযা আসিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়াছি। দুযা যখন আসিয়াছে তখন নিশ্চয়ই ভিন্ন নৌকায় তাহার সঙ্গে পাইকরাও কেহ কেহ আসিয়া থাকিবে। আমাকে লইয়া যে নৌকা আসিয়াছে সেই নৌকায় দুযারা আসিতে পারে না। যাহারাই আসিয়া থাকুক যখন বা যেদিনই আসিয়া থাকুক, সকলেই আমার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কী দুর্দৈব, তাহাদের নিরাশ করিয়া আমি বাঁচিয়া উঠিতেছি। সেই কারণেই শ্যামকান্তি অতি অমঙ্গল ভয়ে দুইবার বলিয়া উঠিয়াছে, কী মহাপাতক। কী মহাপাপ। ইহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে। ভবতারণ খুড়া আমার পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই জলে ডুবাইয়া মারিবার প্রস্তাব করিয়াছে। জ্ঞান যাহাতে আর না ফিরিয়া আসে, তাহার জন্য অম্লকটু দধি গিলাইয়া বুকের পাঁজরায় ও হৃদয়ে শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করিয়া মারিবার চেষ্টা পাইয়াছে। এমন কি নদীর কাদা মিশানো জলও ঢালিয়াছে, যাহাতে গলনালী বন্ধ হইয়া যায়।

'জ্ঞান ফিরিয়া না আসিলে কিছু করিবার ছিল না। দুর্দৈব উহাদের নহে, আমারও। জ্ঞান ফিরিয়া আসাতে, আমি বাধা না দিয়া পারিতেছি না। আমি হাত পর্যন্ত তুলিতে পারিয়াছি। অনুভব করিতেছি অত্যন্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও, জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা শক্তিও অনুভব করিতেছি। ইহা যেন এক অলৌকিক শক্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা বাঁচিয়া

উঠিবার ইচ্ছাশক্তি। স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা হত্যা যে কোন শক্তিকে বাধা দিবার সংকল্পও যেন শরীরে ও মনে প্রবল হইতেছে। অথচ আমি জানি, আমার বাঁচিয়া ওঠাও এক অতি নিদারুণ সংকটের সৃষ্টি করিতে যাইতেছে। সেই সংকটের জন্যই, এখন আমাকে ঘিরিয়া সবাই ফিসফাস করিয়া নিজেদের মধ্যে কিংকর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছে। মনে হইতেছে আমি যেন প্রেতলোকে, প্রেতগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছি।

'দুযার কান্না কথা শুনিবামাত্র, তাহাকে যেমন চিনিতে পারিলাম, জ্ঞান হারাইবার পূর্বের কথা মনে পড়িল, তেমনি ইহাও নিশ্চিত বুঝিলাম আমার মৃত্যু ঘটানোর সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। দুযা যে ব্রহ্মশাপের কথা বলিল, তাহার কারণও আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। তাহার চরিত্র ও মন ভাল জানি। সে নিশ্চয়ই নিজেকে আমার মৃত্যুর কারণ বলিয়া ভাবিতেছিল। এখন আমার মৃত্যু ঘটানোর সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া বারণ করিতেছে। ব্রহ্মশাপ বলিতে, সে আমার দ্বারা তাহার প্রতি শাপের কথা বলিতেছে।

'আমার মুখের মধ্যে এখনও অম্ল কটু দধির স্বাদ। তার সংগে দাঁতে ও জিভে গঙ্গামাটি ও বালি। গলাও শুকাইয়া গিয়াছে। আমি পানীয় জল চাহিলাম। চাহিলাম, কিন্তু নিজেই বুঝিতে পারিলাম, আমি স্পষ্ট কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেছি না। স্খলিত বিকৃত স্বর বাহির হইল। মুখের কাছে যে হাত রাখিয়াছিলাম তাহা নাড়িবার চেষ্টা করিলাম। আবার জল চাহিলাম। কাহারও কোন সাড়া পাইলাম না। মুখের কাছ হইতে হাত সরাইয়া পাশে ছড়াইয়া দিলাম। শক্ত বাঁধানো মেঝে আমার হাতে ঠেকিল। আমি শরীরের অন্যান্য অংশ নাড়িবার চেষ্টা করিলাম। অনুভব করিলাম দুর্বল হইলেও আমার সমস্ত শরীরে চেতনা রহিয়াছে। এ সকলই ভয়ে করিতেছি। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে আমার কেবল জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। আমি সুস্থাবস্থায় বাঁচিয়া রহিয়াছি। আমি পা দুইটি নাড়িতে পারিলাম। কোমরের অংশ তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেও একেবারে নিশ্চল জড়বৎ নহে। বাঁ হাতও ছড়াইয়া দিলাম। চোখ মেলিযা তাকাইবার চেষ্টা করিলাম। পারিলাম না। চোখের পাতা বড় বেশি ভারি বোধ হইল।

'আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি এখন আমার শুশ্রূষার দরকার। এখনও আমার চারি-পাশে সকলেই বাতাসের শব্দে কথাবার্তা কহিতেছে। একটু মিষ্ট পানীয় জল পান করিতে পারিলে চোখে মুখে ঠান্ডা জলের স্পর্শ পাইলে অনেক সুস্থ বোধ করিতে পারি। কিন্তু কোন আশা দেখিতেছি না। মরি নাই। মৃত্যুর দশাও আমার মধ্যে নাই। সে তাহার গ্রাস হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছে। না দিলে কিছুই জানিতে পারিতাম না। অথচ মৃত্যু আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহারা এখনও আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে, প্রত্যাশা করিতেছে হয় তো এই ভাবেই আমার মৃত্যু হইবে।

'এইভাবে সময় কাটিতে থাকিলে হয় তো মরিতেই হইবে। আমি অধিক শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলাম। আমি আবার হাত তুলিয়া মুখের উপর আনিলাম।

চোখের উপর হাত চাপিয়া ধরিলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করিলাম, জল দাও। জবাব না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া আমি বাঁ হাত মাটিতে রাখিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। পারিলাম না। এই সময় কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, অমঙ্গল পাপ যাহাই হউক এরকম অবস্থা চলিতে পারে না। যাহা হয় কর।

'কাহার স্বর। অতি পরিচিত, যেন আমারই বুকের ভিতর হইতে আমারই গলা দিয়া বাহির হইল। ক্ষণ পরেই চিনিতে পারিলাম, কণ্ঠস্বর আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎকান্তির। চিনিতে পারিবামাত্র আমার অন্তর জুড়িয়া যেন বিশাল মেঘের মত ভারি ব্যথা ঘনাইয়া আসিল। মেঘ গলিয়া হৃদয় ভাসাইয়া চোখের কূল ছাপাইয়া বহিতে লাগিল। আমার হৃদয় যে এত দুর্বল, আগে জানিতাম না। অবস্থা বিপাকে কী না হয়। ইতিমধ্যে আমার আশপাশে যাহাদের চিনিতে পারিয়াছি, তাহারা আমাকে কোনদিন কাঁদিতে দেখে নাই। আজ এই অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপস্থিতি জানিতে পারিবামাত্র ভাবাবেগে আমার বুক মথিত করিয়া চোখে জল আসিল।

'বিদ্যুৎকান্তিকে নাটু বলিয়া ডাকা হয়। তাহার স্বর কিছু রুক্ষ শুনাইলেও ভীতির ভাব বর্তমান। তবু তাহার গলার স্বর শুনিয়া আমার পিতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। নাটু শান্ত প্রকৃতির। সে আমাকে সম্ভ্রম করে, কিঞ্চিৎ ভয়ও পায়। সচরাচর আমার সামনে আসিতে চাহে না। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাকে ভালবাসি। সে সংস্কৃত ভালই শিখিয়াছে। আমি নিজে তাহাকে পারশী শিখাইয়াছি। তাহাকে বিষয়কর্ম বুঝাইয়াছি। কিন্তু তাহার মনোগত বাসনা সে কলিকাতায় যাইতে চাহে। আমার তাহা ইচ্ছা নহে। সে কলিকাতায় সাহেবদের পাল্কীর পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া বেড়াইবে। কোম্পানির কাজ করিবে, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। কলিকাতা ও সাহেবদের প্রতি পিতামহ আমার মনে একটা বিরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন।

'সে কথা পরে বলা যাইবে। ভবতারণ ভট্ট খুড়ার স্বর শুনিতে পাইলাম, তোমরা যেরূপ বলিবে, তাহাই হইবে। শ্যামকান্তির শঙ্কিত স্বর শুনিলাম, আমার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কে জানিত এমন সর্বনাশ ঘটিবে। কী মহাপাপ!

'আমার বাঁচিয়া ওঠা সর্বনাশের কারণ। মহাপাপও। আমার প্রত্যাশা নাটু ইহার প্রতিবাদ করুক। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। আমার বাঁচিয়া ওঠা তাহার নিকটও অত্যন্ত অমঙ্গলের বিষয়। ভবতারণ খুড়ো, শ্যামকান্তি সকলেই আমাকে বিশেষ সমীহ করে। শ্যামকান্তির সংসার পৃথক হইলেও সে সর্বদাই বৈষয়িক কাজেকর্মে আমার পরামর্শ গ্রহণ করে। ভবতারণ খুড়া একরকমের মূর্খ পণ্ডিত। গ্রামে গ্রামান্তরে পুজা-পার্বণে পৌরোহিত্য ও সামান্য যজমানি করে। আমাদের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে পড়িলেও উহাদের পরিবারে সংখ্যাধিক্যে বিষয়কর্মে বিমুখী নতায়, যাবতীয় সম্পত্তি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া হতদরিদ্র অবস্থা হইয়াছে।

প্রয়োজন পড়িলেই সে আমার দ্বারস্থ হয়। এখন তাহাদের কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, আমার বাঁচা মরা সব ইহাদের হাতে।

'আমি দুযার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, বাবা ঠাকুরেরা কর্তাদাদাকে একটু জল দিন। আমি মূর্খ মানুষ, শাস্ত্র বুঝি না। বিচার পরে যাহা হয় করিবেন। উনি জল চাহিতেছেন, জল দিন।

'দুযার কথা শুনিয়া তাহাকে আমার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। আমার অবস্থা সে-ই একমাত্র অনুভব করিতেছে। সে শুনিয়াছে, আমি জল চাহিতেছি। অপরেরা সে কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও তাহারা এখনও আমার মৃত্যুই কামনা করিতেছে। দুযার কথায় প্রথম জ্ঞান লাভ করিতেছি। শাস্ত্র হইতে জীবন বড়। তাহার কথা শুনিয়া আমার শক্তি বাড়িল। আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি, বাঁচিয়া উঠিব। ইহার আর অন্যথা হইবার উপায় নাই। মল্লযুদ্ধে বুকে যে সহসা আঘাত পাইয়া অচেতন হইয়াছিলাম, এখন সেই ব্যথা অনুভব করিতেছি না। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে বহিতেছে। কেবল দুর্বল বোধ করিতেছি। মুখের কটু স্বাদে শুকনো গলায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছি না। যদি পারিতাম, তবে আমার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে সবাইকে ডাকিয়া আদেশ করিতাম। সকলের সব তর্কবিতর্ক কথাবার্তা অবাধ্যতা আস্ফালন বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু আমি তো এখন ইহাদের কাছে আর বৈদুর্য্যকান্তি বন্দ্য নহি। বাঁচিয়া থাকিয়াও শবতুল্য।

'আমি আবার সমস্ত শরীরকে আন্দোলিত করিতে চেষ্টা পাইলাম। অধিকতর স্পষ্ট স্বরে বলিলাম, জল দাও। চোখ জলে ভরিয়া ওঠায়, হাত দিয়া ঘষিলাম। অশ্রুতে ভিজিয়া আমার চোখ যেন কিঞ্চিৎ ধুইয়া গিয়াছে। কয়েকবার ঘষিয়া চোখের পাতা হালকা মনে হইল। আমি চোখ মেলিয়া চাহিলাম। অতি উজ্জ্বল আলোতে দৃষ্টি যেন ঝলসাইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু নিরস্ত না থাকিয়া আমি আবার চোখের পাতা খুলিবার চেষ্টা করিলাম। আবার চোখ খুলিয়া গেল। অতি উজ্জ্বল আলো সহিতে পারিলাম না। কয়েকবার এইরূপ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, রৌদ্রালোকিত দিনের আলো ছড়াইয়া রহিয়াছে। তারপর দৃষ্টি মেলিয়া, প্রথমে চোখে পড়িল আমার মাথার উপরে কড়িবরগার ছাদ। চিনিতে ভুল হইল না। ইহা আমার পরিচিত গঙ্গাযাত্রীর ঘর। দৃষ্টি ফিরাইতেই রৌদ্রচকিত গঙ্গা দেখিতে পাইলাম। চোখে সহিল না। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। প্রথমেই নাটুকে দেখিতে পাইলাম। সে আমার মুখের দিকে ভীত আতংকিত চোখে তাকাইয়া রহিয়াছে। আমি উচ্চারণ করিলাম, জল।

'নাটু দ্রুত সরিয়া গেল। আমি আবার চোখ বুজিলাম। নাটুর স্বর শুনিলাম, বাবা জল নিন। নাটুর স্বর আমার শক্তিকে আরও উদ্দীপ্ত করিল। কিন্তু মনে একটু সন্দেহও হইল। সে আমাকে পরিষ্কার পানীয় জল দিবে তো। আমি চোখ মেলিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম নাটুর হাতে কাঁসার ঘটি। সে আমার দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এইবার আমি শ্যামকান্তি ও একটু দূরে দুযার মুখও দেখিতে

পাইলাম। সকলের চোখেই ভয়, দ্বিধা, সংশয়। তথাপি আমি দুযার মুখের দিকে কয়েক নিমেষ বেশি দৃষ্টিপাত করিলাম। নাটুর হাতের ঘটি হইতে জল গ্রহণ করিবার আগে দুযার মুখের অভিব্যক্তি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। সে কোন ইঙ্গিত করে কী না, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। নাটু আমার মুখে সাবধানে জল দিল। আহ্! প্রকৃতই মিষ্ট পানীয় জল। আমি কয়েকবার ঠোঁট ফাঁক করিয়া জল গ্রহণ করিলাম। গলা ভিজিয়া প্রাণটা জুড়াইল। চোখ বুজিলাম।

'মরিতে মরিতে বাঁচিলাম। নিজের শক্তিতে বাঁচিয়াছি। অলৌকিক বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু এইক্ষণে বাঁচিয়া উঠিবার শক্তিকে যেন অলৌকিক বোধ হইতেছে। নাটুর হাতে জল পাইয়া ভাবাবেগে আমার অন্তর অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু আমি নিজেকে শক্ত শান্ত রাখিলাম। কাঁদিবার দিন শেষ হইল, অথবা বাকি জীবিতকাল কেবল কাঁদিবার জন্যই রহিল। এখন আর কাঁদিব না। বাঁচিলাম, কিন্তু জানি, দুর্দৈবে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। জানি না বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হইবে কী না। কিন্তু মৃত্যু কী, আর মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিয়া বাঁচিয়া ওঠা কী, তাহা অনুভব করিলাম। বাঁচিয়া থাকিয়া বুঝিতেছি মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই। আত্মা পরমাত্মা পুনর্জন্ম বাঁচিয়া থাকিবার কাছে সকলই মিথ্যা। সে সব কথা একবারও মনে উদিত হইল না। কেবল ইহাই জানিলাম, আমি নিঃশেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব। জগত সংসার যেমন চলিতেছে তেমনি চলিবে। অথচ মৃত্যু অনিবার্য, ইহা জানি। সেটা ভবিষ্যতের বিষয়। তখন সে কী রূপ ধরিয়া আসিবে জানি না।

'জন্ম মুহূর্ত হইতে মৃত্যু সঙ্গী হইয়া আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। কালগতি এই অনিবার্যতাকে জীবের উপর আরোপ করিয়াছে। ইহা তাহার লীলা। সেই লীলায় মানুষ জন্মিতেছে মরিতেছে, কোনটাই তাহার হাতে নাই। প্রশ্ন থাকিতে পারে, জবাব নাই। তথাপি জীবিত থাকিয়া কেহ মরিতে চাহে না। জীবের ধর্ম সে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। যে চাহে না, সে জীবন্তেই মরিয়াছে। বাঁচিবার অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা শেষ হইয়াছে।

'বাঁচিলাম কিন্তু পূর্বের জীবন আর ফিরিয়া পাইব না। এতকাল নিয়তির অমোঘ নির্দেশকে এক দৃষ্টিতে দেখিতাম। এখন অন্ধের মত ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। জানি না, সে কোন্ পথে আমাকে চালিত করিবে। যাহারা সর্বনাশের কথা বলিতেছিল তাহাদের চিন্তা একরূপ। আমিও এক ভয়ংকর সর্বনাশের মুখোমুখি হইতেছি। এখনও তাহার স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি না। আপাততঃ বাঁচিয়া উঠিলাম, নিধনের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম, ইহাই পরম প্রাপ্য মনে হইতেছে।

'অতঃপর পরিস্থিতির পরিবর্তন হইল। আমাকে গরম দুধ পান করিতে দিল, মিষ্ট জল দিল। আমাকে ঘিরিয়া সকলে বসিল। আমি শায়িত অবস্থায় সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। সকলেই নীরবে আমার মুখের দিকে

দেখিতেছে। সকলেরই মুখ শুষ্ক শীর্ণ, চোখে শংকা ও ভয়। সকলের চোখেই জল। বিশেষ করিয়া দুযা ও আরও দুই পাইক এবং তালুকের আদায় উশুলের হিসাবদারী পরমেশ ভট্টাচার্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। কিছু অপরিচিত মুখও দেখিতেছি। তাহারা আমার সম্পর্কে বলাবলি করিতেছে, ইহার কী দুর্ভাগ্য। গঙ্গাযাত্রা করিয়া বাঁচিয়া উঠিল। কেহ বলিতেছে, একমাত্র ভরসা, ইহার বয়স অল্প, এখনও যুবক।

'নাটু আমার নিকটে বসিয়াছে। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, ভয় নাই, আমার দ্বারা তোমাদের কোন অমঙ্গল হইবে না। নাটু দুই হাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার বয়স সতর। আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিব ভাবিলাম। কিন্তু করিলাম না। শ্যামকান্ত কাঁদিয়া বলিল, আমরা বাড়ি ফিরিয়া কী বলিব। কী করিয়া সকলের সামনে গিয়া দাঁড়াইব।

'ইহা এক প্রকার শোকের কথা বটে। কিন্তু মৃত্যুশোক নহে। ইহা দুর্দৈব দুঃখজনক ঘটনা। সকলেই কান্নাকাটি করিবে, বুক চাপড়াইবে। জীবনযাপনের আদৌ কোন পরিবর্তন হইবে না। পরিবর্তন যেখানে ঘটিবার তাহা বিষয়-সম্পত্তিজনিত। শ্রাদ্ধাদি বা পারলৌকিক কোন কাজ করিতে হইবে না। তবে, পরিবর্তন একেবারে না হইবে এমন নহে। সে কথা এখন ভাবিতে পারিতেছি না। বাড়ির কথা মনে হইলেই প্রাণটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিতেছে। অথচ ইহা নিরর্থক।'



অকুর ব্যবস্থা ভালোই করেছে। দু দিন কেটে গিয়েছে। অকুর রাত্রে রান্না করে, তাপসের জন্য দুপুরের ভাতেও জল দিয়ে রেখে দেয়। ভোরবেলা বেরিয়ে যায়। তাপস কুটোকাটি জেলে চা তৈরি করে নেয়। দিবানিদ্রার কোনো প্রশ্নই নেই। ও যেন স্থান কাল ভুলে গিয়েছে। ডুবে গিয়েছে পাণ্ডুলিপির মধ্যে। অকুর ফিরে এসে, রান্না খাওয়ার পরে তাপস মোমবাতি জেলে রাত্রেও অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ওর মনের মধ্যেও একটা উত্তেজনা যা ওর ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। যখন নিতান্ত শরীর এলিয়ে পড়ে, তখন একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিশেষ করে মধ্য রাত্রের পরে ঘুমিয়ে শেষ রাত্রে যখন জেগে ওঠে তখন পাণ্ডুলিপির লেখক বৈদূর্যকান্তির অস্তিত্ব যেন ওর কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে। শুধু মানুষটিকেই যে দেখতে পায়, তা না। তাঁর মনের গভীরে যেন ও ডুবে যায় এবং নিজের জীবনের সঙ্গে কেমন একটা একাকার বোধ জন্মায়।

শেষ রাত্রের প্রচ্ছন্ন আলো, আকাশের বুকে ক্রমে হারিয়ে যাওয়া অবশিষ্ট কয়েকটি তারা, পাখির ডাক, গঙ্গার ছলছলানি, এ সবের মধ্যে সেই কাল ফিরে

আসে। পাণ্ডুলিপির ঘটনার আবিষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। প্রাতঃকৃত্যাদি, অন্ধকার থাকতে থাকতেই স্নান করে নেওয়া, এ সমস্তই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঘটে। বৈদূর্য্যকান্তি ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে এমনভাবে বিদ্ধ হয়ে আছেন, যেন তিনি তাপসের মধ্যে একটি অলৌকিক অস্তিত্বের মতো বিরাজ করছেন। যে-কারণে স্থান কাল কোনো কিছুই আর ওকে স্পর্শ করছে না। পাণ্ডুলিপির অনুবাদের মধ্যেই ওর সহজ বিচরণ চলছে।...

'রাত্রি পোহাইল। সারা রাত্র গভীর নিদ্রায় যাপন করিয়াছি, এমন বলা যায় না। নিধনের ভয় আর ছিল না। ভবতারণ খুড়া বা শ্যামকান্তি সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিল। তথাপি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। নাটুকে বিশ্বাস ছিল। তা ছাডা দুযাকে আমি নিজে সারা রাত্রি জাগিয়া আমার কাছে থাকিতে বলিয়াছিলাম। সে অন্যথা করে নাই, আমার নির্দেশের ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে এখনও আমার পূর্ণ বশে আছে। তাহার চিত্ত পরিবর্তনেব কোন কারণও ছিল না। অন্য দুই পাইক এবং পরমেশ ভট্টাচার্য সারা রাত্রি জাগিয়াই কাটাইয়াছে।

'আমি বাঁচিয়া উঠিলাম, কিন্তু নিদ্রা হয় তো আমাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিদ্রা আসিযাছে, আবার ভাঙিগয়াছে। আর তাকাইয়া দেখিয়াছি। আমার অদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দুযা এবং দুই পাইক নড়িয়া চড়িয়া বসিয়াছে। অন্যান্যরা আমাব শিয়রেব দিকে দক্ষিণে নিদ্রা যাইতেছিল। আমার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। নিদ্রা আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছিল। উহা নিদ্রার ঘোর মাত্র। কেবলই গৃহের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আর নিদ্রা ভাঙিগয়া যাইতেছিল। কখনও স্বপ্নের মধ্যে দেখিতেছিলাম, চুম্বকীর সঙ্গে পাশা খেলিতেছি। চুম্বকী তাহার প্রকৃত নাম নহে। প্রকৃত নাম ইন্দুমতী। আমার চৌদ্দ বছব বযসে তার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। সে আমার প্রথম স্ত্রী নহে। এগার বছর বয়সেই আমার প্রথম বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। বার বছব বয়সে আবাব একটি। কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়ার সঙ্গে আমার কখনও সংসার করা হইয়া ওঠে নাই। প্রথমা বিবাহের পরে পিত্রালয়ে গিয়া বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছিল। দ্বিতীয়া পিত্রালয়ে যাইবার পরে, তাহাকে আর কখনই আনা হয় নাই। কেন আনা হয় নাই, আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। কারণ আমার জিজ্ঞাসা করিবার বয়স বা অবকাশ কোনটাই তখন হয় নাই। চৌদ্দ বছর বয়সে আবার বিবাহ। এই তিনটি বিবাহ পিতামহ দিয়াছিলেন। একমাত্র সেই সময়েই আমি জানিতে পারি, দ্বিতীয়া পত্নীকে না আনার কারণ ছিল, তাহাদের পরিবারের একটি কলংকিত ঘটনা।

'এখন আমার কাছে তাহা আর কলংকিত বলিয়া মনে হয় না। পিতামহের মুখে শুনিয়াছিলাম, দ্বিতীয়া পত্নীর মা তাহার বড় জামাইয়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল। সেই ব্যভিচারের কথা প্রচার হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে আমার দ্বিতীয়া পত্নীর কোন দোষ থাকিতে পারে বলিয়া মনে করি না। পিতারও থাকিতে পারে বলিয়া মনে কবি না। এ সব বর্তমানের মনের কথা। তখন এইরকম ভাবি নাই। চৌদ্দ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে ইন্দু-

মতীর সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। সে আমার অপেক্ষা ছ বছরের ছোট ছিল। আমরা কুলীন ছিলাম। কুলচন্দ্রিকার ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়া এখন আর সপ্তশতী মেলবন্ধন ইত্যাদি বিষয় ছাই ভস্ম বলিয়া মনে হয়। উহার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। অতঃপর ত্রিশ বছর বয়সে, আবার একটি বিবাহ করিয়াছিলাম। কুলীন কন্যাটির বয়স তখন তের হইয়াছিল। নাম লক্ষ্মণা। এই বিবাহ দিয়াছিলেন আমার পিতা। আমার মায়েরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল। সত্য কথা, লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিতে আমারও অসম্মতি ছিল না। বিবাহের মাত্র কয়েক মাস আগে, তাহাকে একবার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। বাবা তখন মুরশিদাবাদে নায়েবী সুবাদার সরকারের কাজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া, আমার উপর দিয়াছিলেন। নিজে বংশবাটি রাজবাড়ির সেরেস্তায় কাজ করিতেছিলেন। আমাকে কখনও কখনও বংশবাটিতে পিতার কাছে যাইতে হইত। সেরেস্তারই এক কর্মচারী বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় পিতার বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বংশবাটিরও বাসিন্দা ছিলেন। আমার পিতা এবং চট্টোপাধ্যায় উভয়েই ন্যায় সাংখ্য তন্ত্র ইত্যাদি লইয়া অবসর সময়ে চর্চা করিতেন। শুনিয়াছিলাম, বঙ্কুবিহারী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে আমি সাত বছর বয়সে সংস্কৃত পাঠ করিতে আসিয়াছিলাম। সরাসরি তাঁহার নিকট আমার সংস্কৃত শিক্ষা হয় নাই। তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যামের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু সেই মহাপণ্ডিতকে আমি অনেকবারই দেখিয়াছি। শুনিয়াছিলাম এই বংশের সঙ্গে বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের বংশের সম্পর্ক ছিল। খনের চাটুতির সঙ্গে কী রূপে এই পালধি কাশ্যপ গোত্রীয়দের বংশগত সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না। কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ইহা আমার মনে বিশেষ একটি ক্রিয়া করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বিবাহের কয়েক মাস আগে, একদিন দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ পাইয়া, পিতার সহিত আমি বঙ্কুবিহারী চট্টোর বাড়ি গিয়াছিলাম। তখন আমি লক্ষ্মণাকে দুই এক মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিলাম। সুন্দরীকে দেখিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা মনে হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম বিবাহিতা। দুই মুহূর্তের দেখায়, সে সধবা কি কুমারী, বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বাড়ির ভিতর যাইবার সময় সহসা সে আমার সামনে পড়িয়া গিয়াছিল। সেই কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই লক্ষ্মণা দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল।

'ইন্দুমতীকে যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স আট। আমার পিতামহের রুচিকে প্রশংসা করিতেই হইবে। কেবল ফুলিয়া মেলের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বংশের কুলীন কন্যা নহে, ইন্দুমতী দেখিতেও অতি রূপসী ছিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, বিশালাক্ষী, অনধিক উন্নত নাসা, বিম্বোষ্ঠা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, মা যখন ইন্দুমতীকে বরণ করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, রূপ দেখিয়া ভয় লাগে। ঈশ্বর ইহাকে যেন সুমতি দেন, রূপের অহংকার যেন না জন্মায়, তাহা হইলে সংসারের মঙ্গল হইবে না। মা কেন

এ কথা বলিয়াছিলেন. পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রূপসীদের রূপের অহংকার থাকিলে, সে নিজেকে লইয়া মত্ত থাকে। সংসারের ও গুরুজনদের প্রতি অবজ্ঞা জন্মায়, স্বামীকে বশে রাখিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হয়। ইহা অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু ইন্দুমতীর সে অহংকার ছিল না। সর্ব সুলক্ষণা বলিতে যাহা বুঝায়, ক্রমে তাহার মধ্যে তাহাই বিকশিত হইয়াছিল। আমার গর্ভধারিণী তাহাকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

'চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইন্দুমতীকে দেখিয়া আমিও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু সে তখন বালিকা মাত্র। আমার প্রথম যৌবনের বিকাশ ঘটিয়াছিল। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার ও সৈদাবাদে যাতায়াত করিয়া, নরনারীর মিলন সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে অভিজ্ঞতা আদৌ সুখের ও সুস্থ ছিল না। পিতামহ বা পিতার মুখে যে মুর্শিদাবাদের কথা শুনিয়াছি, আমার সময়ে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। সুবাদার অর্থাৎ নবাব তখন ইংরেজের বেতনভোগী নায়েব সুবাদার। তাহাদের আত্মীয়বর্গ পরিবারগুলির, আমার সমবয়সী যে সব সন্তানের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ছিল সুরা ও কামাসক্ত। বারাঙ্গনার অভাব ছিল না। লেখাপড়ায় বা শরীর চর্চায় তাহাদের উৎসাহ ছিল না। অথচ তাহাদের অনেকের সঙ্গেই আমার মেলামেশা ছিল। তাহারা এতদূর অধঃপতিত ছিল, বয়সে বড় বারাঙ্গনাদের গৃহে আনিয়া তাহাদের সংসর্গ করিত।

'পিতামহ এ সবই জানিতেন। আমাকে স্পষ্ট করিয়া সব বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমার কখনও সেইরূপ প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু নবাব পরিবারের সেই সব সন্তানেরা ছিল অত্যন্ত নির্লজ্জ। আমার চোখের সামনে তাহারা বারাঙ্গনাদের সঙ্গে, নগ্ন উল্লসিত পশুর ন্যায় আচরণ করিত। আমাকে প্ররোচিত করিত। চলিয়া আসিতে চাহিলে বাধা দিত। তাহাদের হিন্দু মুসলমান আড়কাঠি ছিল, যাহারা নতুন নতুন গণিকাদের সন্ধান আনিয়া দিত। অবশ্য আড়কাঠিরা বলিত, উহারা গণিকা নহে, গৃহস্থ কন্যা।

'উক্ত ঘটনা সমূহ দেখিয়া আমার একপ্রকার বিবমিষার উদ্রেক হইত। কিন্তু কৈশোর ও যৌবন সন্ধিতে, আমার শরীরে ও মনে উহার একটা প্রতিক্রিয়া হইত। প্রবৃত্তি না হইলেও, এই প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না। আমি নিয়মিত উহাদের পাশবিক লীলাস্থলে উপস্থিত থাকিতাম না। রেজা খাঁর এক দৌহিত্রের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বেশি বন্ধুত্ব ছিল। সে-ই আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইত।

'ইন্দুমতীকে দেখিয়া আমি মনে মনে নানা কল্পনা করিতাম। কিন্তু বালিকার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কম হইত। আমাকে প্রায়ই মুরশিদাবাদে যাইতে হইত। ইন্দুমতীও পিত্রালয়ে যাইত। গৃহে থাকিলে সে প্রায় সময়েই মায়ের কাছে থাকিত। রাত্রে সে মায়ের কাছে শয়ন করিত। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। প্রথমে সে লজ্জা পাইয়া মাথার ঘোমটা মুখ অবধি টানিয়া দিয়া পলাইত। কখনও ঘরের মধ্যে আমার সম্মুখে পড়িয়া গেলে, জড়সড় হইয়া পালাইবার পথ খুঁজিত। আমি তাহার হাত ধরিয়া

কাছে টানিয়া বুকের কাছে স্পর্শ করিতাম। সে ভীত শশকের মত ছটফট করিত। আমি হাসিয়া ছাড়িয়া দিতাম। তাহার পায়ের গুলুর গোটামলে ঘুংঘুর ছিল। ছাড়া পাইয়া, ঝমঝম শব্দে দৌড়িয়া পলাইত। ক্রমে সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাকে দেখিলে, ঘোমটা টানিবার আগে সে হাসিয়া, চোখের দ্যুতিতে বিঁধাইয়া নাকের নথে ঝিলিক দিয়া ঠোঁটের ভঙ্গি করিয়া পলাইত। ধরা পড়িলে, পলাইবার ভান করিত, সহসা পলাইত না। চুম্বন করিলে শাড়ির আঁচলে ঠোঁট মুছিয়া সলজ্জ ধ্বনি করিত, ছি।

'এগার বছর অতিক্রম করিতেই তাহার রজঃদর্শন হইয়াছিল। তারপরে তাহার সঙ্গে আমার সংসর্গ হইয়াছিল। তখন হইতে তাহাকে আমি চুম্বকী বলিয়া ডাকিতাম। চুম্বক পাথরের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না, উহা অয়স্কান্তমণি। তথাপি আমি তাহাকে চুম্বকী বলিয়া ডাকিতাম। সে আমাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। তের বছর বয়সে তাহাব প্রথম কন্যা সন্তান হইয়াছিল। সে কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যাব জন্মের পরে একটি পুত্র জন্মিয়া এক বৎসর পরে মারা যায়। তারপরে নাটুর জন্ম হয়। নাটুরও দুইটি বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। ইন্দুমতী সুখী ছিল। আমিও সুখী ছিলাম। নাটুর জন্মের পরেও তেইশ বছর বয়সে ইন্দুমতীর আর একটি পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম নীলোজ্জ্বলকান্তি, নীলু বলিযা ডাকা হয়। তাহার এখন এগাব বছর বয়স। বিবাহের কথাবার্তা শুরু হইয়াছিল, তার মধ্যেই আমার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

'ইন্দুমতীর যখন চব্বিশ বছর বয়স, আমাব তিরিশ। আমি লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিয়া আনিলাম। বিবাহের আগেই ইন্দুমতী নাটু ও নীলুকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মণাকে বিবাহের প্রস্তাব শুনিবার পর হইতেই, ইন্দুমতীর মুখ শুকাইয়াছিল। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সে আর সপত্নীর আশংকা করে নাই। মাঝে মাঝে নিজেই ঠাট্টা করিয়া বলিত, আমি আর কতকাল তোমাকে ধরিয়া রাখিব। আমার বয়স হইয়াছে। তুমি এখনও যথেষ্ট সতেজ সবল আছ। আর একটি বিবাহ কর।

'জানিতাম ইহা ইন্দুমতীর মনের কথা নহে। সে বয়সের কথা বলিলেও সন্তানদের জন্মেব পরেও তাহাকে উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী বলিয়া বোধ হইত। তাহাব রূপে ও স্বাস্থ্যে একটা খরতা ছিল। বয়সে কিঞ্চিৎ নম্রতা আসিলেও, তাহার স্বাস্থ্যে বিস্ময়কর উজ্জ্বল প্রভা ছিল। তাহার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ নিষ্প্রভ হয় নাই। তাহাকে যুবতীর ন্যায় দেখাইত। সে নিজেও তাহা জানিত। বলিতে কি, এখন চৌত্রিশ বছর বয়সেও তাহাকে বাইশ চব্বিশ বছরের বেশি মনে হয় না। দাসী নাপিতানীরা তো তাহার রূপ লইয়া কত কথাই বলিত। মা বাঁচিযা থাকিয়া সংসারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেন। অতএব ইন্দুমতী গৃহিণী হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। শাশুড়ির নির্দেশে সংসাব করিত, এবং আমার অতি আদরের সোহাগিনী বধূটিই ছিল। আমি তাহার রূপের প্রশংসা করিলে, সে বলিত, ইহা

তোমারই সুখ সোহাগের দান। যদি সত্যই আমার রূপ ও স্বাস্থ্য থাকিয়া থাকে, ইহা তোমার সুখেরই কারণে। তোমার সুখই আমার রূপ।

'ইন্দুমতী কথা বলিতে শিখিয়াছিল, না শিখিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমার সুখেই হোক বা তাহার নিজের সুখেই হোক, একমাত্র তাহাতেই, ঐরকম রূপ ও স্বাস্থ্য থাকিতে পারে না। ইহা জন্মসূত্রে পাওয়া। আমার বৈমাত্রেয় ভাই শ্যামকান্তির প্রথমা স্ত্রী ইন্দুমতীর সমবয়স্কা হইয়াও প্রায় প্রৌঢ়া হইয়াছিল। সে সুখী ছিল কী না জানি না। শ্যামকান্তির আরও দুইটি সংসার রহিয়াছে। অর্থাভাব বা সুখাদ্যের অভাব নাই। প্রথমা স্ত্রীর কর্তৃত্বও বেশি। কারণ শ্যামকান্তির মা আমার বিমাতা মারা গিয়াছেন। শ্যামকান্তির স্ত্রীরা সকলেই ইন্দুমতীকে ঈর্ষা করে। সংসার অতি অভিনব স্থান। আমার মাও যে ইন্দুমতীকে ঈর্ষা করিতেন তাহা বুঝা যাইত। এমন কি সম্প্রতি নাটুর দুই পত্নীও শাশুড়ির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। চৌত্রিশ বছর বয়সের শাশুড়ির প্রতি এগার বার বছরের পুত্রবধূরা ঈর্ষা পোষণ করে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু সত্য।

'লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিবার আগেও অনেকবারই আমার আরও বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। বরং এক স্ত্রী লইয়া সংসার যাপন করিতেছিলাম, ইহাতেই সকলে বিস্মিত হইত। আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, দরিদ্র কুলীনও অনেক বেশি বিবাহ করিত। বৎসরের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্বশুরালয়ে যাপন করিত। বংশবাটিতে লক্ষ্মণাকে না দেখিলে, আবার বিবাহ করিতাম কী না, তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। সে নিতান্ত বালিকা হইলে, কখনই বিবাহ করিতাম না। তের বৎসর বয়স বড় কম নহে। কুলীন কন্যা বলিয়াই ঐ বয়সে অনূঢ়া থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু বংকু-বিহারী চট্টোঃ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুলীন সুপাত্রের সন্ধান পাইতে-ছিলেন না। আমাকে দেখিবার পরে, আমার পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পিতার কাছ হইতে শুনিয়া মাও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপরে আমিও দেখিয়াছিলাম। ইহা আমার কাছে ত্র্যহস্পর্শ দোষ মনে না হইলেও, ইন্দুমতীর নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল।

'বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দুমতীর মুখ শুকাইয়াছিল। সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছিল। দৃষ্টিতে সংশয় ও জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। রাত্রে শয়ন ঘরে শয্যায় সাক্ষাৎ ঘটিলে রমণীর মনের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। যে ইন্দুমতী কোন অবস্থাতেই আমাকে মিলনে বিমুখ করে নাই, লক্ষ্মণাকে বিবাহের প্রস্তাব শুনিবার পরে, প্রথম দিনই আমার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে তাহার শরীরে অসুস্থতা বোধ হইয়াছিল। অথচ আমার প্রতি অনুরাগ দমন করিতেও পারে নাই। আত্মসমর্পণ করিলেও, আমার স্পর্শ মাত্র যাহার শরীরে রতি রাগের হিল্লোল বহিয়া যাইত, সেই রূপ দেখি নাই। শৃঙ্গারে অঙ্গ সঞ্চালনে অনীহা, নিতান্ত আমার সুখবিধানে, সংসর্গ করিয়াছিল। তের বছর ধরিযা আমার সংসর্গে যাহার সকল লজ্জা ঘুচিয়া

গিয়াছিল সেই চন্দ্রকী এমন কি সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হইতেও কুণ্ঠা দেখাইয়াছিল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিল। আমারও দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছিল। তাহার কষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কথার দ্বারা সান্ত্বনা দিতে চাহি নাই। সোহাগে আদরে ভুলাইতে চাহিয়াছিলাম। সে কাঁদিয়াছিল। যখন কথা বলিয়াছিলাম, সে হাসিয়াছিল। আমার অন্তরে তাহার স্থান সর্বোচ্চে। সে আমার চন্দ্রকী, এই কথা শুনিয়া আরও বেশি হাসিয়াছিল। আরও বেশি চোখের জলে ভাসিয়াছিল। বলিয়াছিল, আমার অনেক সৌভাগ্য, বহুকাল তোমাকে একলা ভোগ করিয়াছি। অনেকের অনেক হিংসা কুড়াইয়াছি। আর আমাকে কেহ হিংসা করিবে না।

'ইহা যে ইন্দুমতীর মনের কথা ছিল না, তাহা সামান্য বালকেও বুঝিতে পারে। হিংসার কথা সে মিথ্যা বলে নাই। ইতিপূর্বে তাহার প্রতি হিংসাবশতঃ আমাদের পরিবারের বা অন্য পরিবারের স্ত্রীলোকেরা কেহ কিছু কটু কথা বলিলে সে আমাকে তাহা বলিয়া হাসিত। স্ত্রীলোকদের সকলেরই স্থির বিশ্বাস ছিল, সে আমাকে বশীকরণ করিয়াছে। এমন কি শ্যামকান্তির প্রথমা পত্নী তাহার কাছে আসিয়া বশীকরণের মন্ত্র ও করণ-কারণ জানিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিত। অনেক কান্নাকাটি করিত। ইন্দুমতী সত্যি কথা বলিয়া তাহার অসহায়তা জানাইলে, অবিশ্বাসে কুপিত ও ক্রুদ্ধ হইত। মুখের উপর বলিত, আমাকে বঞ্চিত করিলে। তোমারও চিরকাল এইরূপ সুখে কাটিবে না। মনে রাখিও, তুমি কুলীনের বউ। কবে একদিন হঠাৎ সপত্নী আসিয়া জুটিবে, তুমিও বলিতে পার না। এ সব কথা আমি ইন্দুমতীর কাছেই শুনিতাম।

'ইন্দুমতী আমাকে শ্যামকান্তির প্রথমা পত্নীর সে-কথা বলিতেও ভুলে নাই। কেবল তাহার দুঃখ, বশীকরণের বিষয়ে সকলেই তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। সে হাসিয়া বলিয়াছিল, এইবার হয় তো সকলের বিশ্বাস হইবে, আমি বশীকরণ করি নাই। করিয়া থাকিলেও তাহা বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরো ছাড়া কিছু নহে। বেচারি চাঁপিকে এখন সকলেই নাক কুঁচকাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বাক্য যন্ত্রণা দিতেছে। সে আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আমি তাহাকে বলিয়াছি, তুই কাঁদিস কেন। ঈশ্বর তোর আমার সাক্ষী রহিয়াছেন। উহাদের কথা কানে নিস না।

'চাঁপি দুযার স্ত্রী। জল না চলিলেও চাঁপি তাহার প্রিয় দাসী ছিল। শ্যামকান্তির স্ত্রীদের এবং অন্যান্যদের এইরকম বিশ্বাস ছিল, চাঁপিই গোপনে ইন্দুমতীকে বশীকরণের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। কারণ চাঁপির সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ ছিল। বশীকরণ করিবার জন্য এক শ্রেণীর বিশেষ স্ত্রীলোক ও ওঝা এবং বৈদ্য আছে। তবে এ বিষয়ে, ডাকিনী স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ পারদর্শিনী। ঐসব বিদ্যা তাহাদের জানা আছে। চাঁপির পক্ষে তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা ছিল। অতএব, সকলের বিশ্বাস, ইন্দুমতী তাহার সাহায্যেই বাহির হইতে বশীকরণের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমি জানিতাম, ইন্দুমতী বশীকরণ করাকে পাপ বলিয়া মনে করিত। তাহার বিশ্বাস, উহাতে স্বামীর অমঙ্গল

ছাড়া মঙ্গল হয় না। সংসারেরও অমঙ্গল হইয়া থাকে।

'কুলীনের ঘরে ঘরে নানা রকমের বশীকরণ করার নানা উপায়ের কথা আমিও শুনিয়াছি। সতীন শাশুড়ি ননদ, সবাইকেই বশীকরণের নানা প্রকরণের কথা শুনিলে, অবাক হইতে হয়। কখনও কখনও তাহা বীভৎস ডাইনি বিদ্যা বলিয়া মনে হইত। মড়ার খুলি, পাঁজরার হাড়, তন্ত্রের ভৈরবী চক্রের শুক্র শোণিত মিশ্রিত সিন্ধবস্ত্র সিন্দুর ফুল, ইত্যাদি। ইহা তান্ত্রিকদের কাছেই পাওয়া সম্ভব ছিল। ডাইনি ওঝা বৈদ্যরাই এসব তাহাদের সংগ্রহে রাখিত। আরও শুনিয়াছি, শ্মশানের ক্ষীরা (শসা?) কবর লিছাতি, (কবরের ওপর বিছানো কাপড়) কালো গরুর গাঁজ, সাপের গায়ের এঁটুলি, জলো জোঁক, শাদা কাকের রক্ত। এইরকম আরও নানা কিছু বশীকরণেব কাজে লাগিত। আমি নিজে ইন্দুমতীকে সে সব কথা বলিলে ইন্দুমতী হাসিয়া বলিত, তুমি শুনিয়াছ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তোমার ভাইয়ের বউদের কাছেই দেখিয়াছি।

'লক্ষ্মণার সঙ্গে বিবাহের দিন স্থির হইবার পরে ইন্দুমতী কয়েকদিন বাড়িতে ছিল। সে স্বাভাবিকভাবেই সংসাবের নিত্য কাজ করিয়াছে। সকলেব সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিয়াছে। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন রাত্রে শয়ন ঘরে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তখন তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। তাহার সেই সুখ সোহাগ স্ফুর্তি কিছুই ছিল না। আমি চাহিলে নিতান্ত সংসর্গ করিতে হয় তাই করিত। এমন নহে যে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিত। তাহার মুখের ঔজ্জল্য ছিল না, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল, কিছুটা নির্বিকার অন্যমনস্ক থাকিত। আমি সান্ত্বনার কথা বলিলে হাসিত, বলিত, তোমার কথা শুনিয়া হাসি পায়। যাহা অনেক আগেই ঘটিবার কথা, তাহা পরে ঘটিতে যাইতেছে। সংসারে যাহা প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহার বিষয়ে বলিবার কী আছে। আমি তোমাকে সুখী দেখিতে চাহি। ইহার অধিক কিছু চাহি না। বহুকাল একলা ভোগ করিয়া আমার অভ্যাস খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে হয়তো মনটা একটু খারাপ হইয়াছে। কিন্তু সংসারে যাহা সত্য, তাহাকে মানিয়া লইতেই হয়। ভবিতব্য কেহ খণ্ডাইতে পারে না। আমাকে কেহ হিংসা করিয়া শাপ দিয়াছে তাহা বিশ্বাস করি না। এই গোটা গ্রামে আমার মত সৌভাগ্যবতী কে আছে। আমি এখনও তাহা বিশ্বাস করি। তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন করিবার নাই। এখন আমার যে অবস্থা দেখিতেছ, তাহার জন্য আমারও খারাপ লাগিতেছে। তুমি দুঃখ পাইতেছ। তুমি আমার অপেক্ষা সব বিষয়ে জ্ঞানী ও গুণী। সব বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। মন হইতে ত্যাগ করিও না, এই ভিক্ষা চাই। তাহা হইলে জীবন্তে মরিব।

'ইন্দুমতীর প্রতিটি কথাই সত্য। সে মিথ্যা বলে নাই, বরং সংসারের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবসম্মত কথা বলিয়াছিল। কেবল তাহার অভিমানের কথা বলে নাই। কষ্টের কথা বলিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মণার সঙ্গে বিবাহের দিন স্থির হইবার পরে, সে আর একদিনও আমার সঙ্গে পাশা খেলিতে বসে নাই। বিবাহের আগে

পিত্রালয়ে সে গৃহে ভগ্নি ও ভ্রাতৃবধূদের কাছে সামান্য পাশাখেলা শিখিয়াছিল। আমি তাহাকে ভাল করিয়া শিখাইয়াছিলাম। একবার শিখিলে ইহাতে কৌশলের বিষয় কিছু নাই। সবই দানের (চালের) উপর নির্ভর করে। দানের উপর কাহারও হাত থাকে না। উহা ভাগ্যের বিষয়। বাইরে অন্যান্যদের সঙ্গে চৌপড় (চারজনের) চলিত। ইন্দুমতীর সঙ্গে রঙ (দুজনের)। খেলার মধ্যে কৌশলের বিষয় কিছু না থাকিলেও ইন্দুমতীর ভাগ্য সর্বদা আমার অপেক্ষা ভাল ছিল। সেজন্য তাহাকে আমি ঠাট্টা করিয়া নর্দবাজীনী (নর্দবাজ ভাগ্যবান ভাল খেলোয়াড়) বলিতাম। ঘরে খেলিবার জন্য দুইটি ছক ছিল। একটি মোটা তশরের উপর রেশমের রং করা সুতায় তৈরি। অন্যটি ইন্দুমতী নিজে কাপড়ের উপর রঙীন সুতা ও সূঁচ দিয়া তৈরি করিয়াছিল। সাধারণে যেরূপ কাঁথার মত তৈরি করিত, ইন্দুমতীর হাতের কাজটি তাহা হইতে অনেক সুন্দর ছিল। যেন কাশ্মীরি শালের উপরে, শালকরের সূক্ষ্ম কাজের মত তাহার ছকটি দেখিতে ছিল। তশর রেশমের ছকটি পিতামহ আমাকে দিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে হাতীর দাঁতের তিনটি শারি (দান চালবার তিনটি ঘুঁটি)। ইহা ছাড়া, হাতীর হাড়েরও শারি ছিল। ছকের ঘুঁটিও ছিল দুই রকমের। বয়রার আর কাঠের। বয়রার ঘুঁটিগুলিও পিতামহের দান ছিল।

'ইন্দুমতী যখন গজদন্তের শারিগুলি দুই হাতের মধ্যে লইয়া শব্দ করিয়া নাড়াচাড়া করিত, তখন আমার চোখে চোখ রাখিত। তাম্বুল রঞ্জিত ঠোঁটে যেন রহস্যের হাসি ফুটিত। সর্বক্ষণের জন্য নথ নাকে থাকিত না। নোলক ও নাকফুল (নাকচাবি) দুইটি তাহার নাসারন্ধ্রের সঙ্গে কাঁপিত। ঠোঁট নাড়িয়া কিছু বলিত। যেন দান দিবার আগে সে মন্ত্র পড়িয়া আমাকে সম্মোহিত করিত। তারপরে সহসা সুসে পাঞ্জা দো এক ছ'য়ে দরজা খুল্ বলিয়া ধ্বনি করিয়া ঝটিতি শারি চালিয়া দিত। আমি তাকিয়া ফেলিয়া, মুখের ফরাসির নল টানিতে ভুলিয়া, রুদ্ধশ্বাস হইয়া তাহার দানের অপেক্ষা করিতাম, আর বিস্মিত হইয়া দেখিতাম, শারিগুলি যেন তাহার হাতের ক্রীড়নকের মত দুইটি পাঁচ ও একটি ছ'য়ে স্থির হইয়া রহিয়াছে। আমি বিস্ময় বিমূঢ় চোখে চুম্বকীর মুখের দিকে তাকাইতাম। তাহার চোখের কালো তারা দুটিতে ঝিলিক হানিত। সে বাঁ হাতের তর্জনীটি গালে রাখিয়া বিজয়িনীর মত আমার দিকে দেখিত। পরক্ষণেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত। বসিবার ভঙ্গি বদলাইতে গিয়া তার পায়ের মলে, হাতের চুড়ি ও রুলিতে হাসির শব্দের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া ঝনাৎকারে বাজিয়া উঠিত। সচরাচর আসন্ন বিকালে খেলা হইত তখন চুম্বকীর চুল খোলা থাকিত, আর বুকের স্খলিত আঁচলের সঙ্গে খোলা দীর্ঘ কেশ কাঁধে বুকে লুটাইত। জিজ্ঞাসা করিত, প্রভুর কী হইল।

'আমি আবার শারিগুলির দিকে বিমূঢ় বিভ্রান্ত চোখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, কি করিয়া এরকম হইল। ইহা কি শকুনির শারি নাকি। কী মন্ত্রই বা আওড়াইলে। চুম্বকী আমার অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া, আবার হাসিয়া

উঠিত। বলিত, শকুনির শারি হইবে কেন। ইহা তোমারও শারি। মন্ত্র কিছুই আওড়াই নাই, কেবল তোমার ধ্যান করিয়া দান দিয়াছি।

'চুম্বকীর কাছে পরাজয়ে আমি সুখী হইতাম। তবে আমার জয়ের ইচ্ছাও প্রবল হইত। কিন্তু অধিকাংশ দিনে আমি পরাজিত হইতাম, আর চুম্বকীর উল্লাস দেখিয়া মনে মনে আমিও উল্লসিত হইতাম। তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইতাম। ক্রমাগত পরাজয়ের পরে হতাশ হইয়া আমার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিত, চুম্বকীকে কাছে টানিয়া আদর ও সোহাগ করা।

'চুম্বকীর দানে উহার হাত সহজেই খুলিয়া যাইত। আসলে সে আমার অপেক্ষা বেশি মনোযোগী ছিল। শারিগুলি লইয়া হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করিবার সময়, সে শারিগুলোকে এমন একটা সংস্থানে আনিত, এমন সাবধানে দান চালিত, তাহাতেই তাহার প্রার্থিত সংখ্যা মিলিয়া যাইত। সর্বদাই যে এরূপ হইত তাহা নহে। সে পরাজিতও হইত। পরাজিত হইলেই তাহার মুখ ভার হইয়া যাইত। এমন কি রাগিয়াও উঠিত। তখন আমার হাসিবার পালা আসিত। আমার হাসি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত। তথাপি বলিতেই হইবে, তাহার পাশার হাত ভাল। যে কারণে তাহাকে আমি নর্দবাজীনী বলিতাম। চুম্বকী 'সুসে' উচ্চারণ করিত পাকা আরবিভাষী জুয়াড়ির মত। আর আমি প্রায়ই দদুরম্ (জুয়া পুরুষের সিংহাসনহীন রাজ্য) বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতাম। চন্দেল মন্দেলের (মোগলাই ভাষা) চালের বদলে আমি সংস্কৃত প্রাচীন শব্দও ব্যবহার করিতাম। তিয়া দুরা নান্দী পুরা ইত্যাদিকে ত্রেতা পাবর নর্দিত কট বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতাম। আর নর্দবাজীনী চুম্বকী আমার ঘুঁটিগুলিকে গ্রাস করিয়া লইত।

'লক্ষ্মণার সঙ্গে আমার বিবাহের দিন স্থির হইয়া যাইবার পরে, ইন্দুমতী পাশা খেলিতে বড় আলস্য বোধ করিত। তাহার শরীর ভাল থাকিত না। জোর করিয়া বসাইলে সে কেবলই হারিত। তারপরে বিবাহের পক্ষকাল আগে সে নীলু ও কোলের বৎসরেক পুত্রটিকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। যাইবার পূর্বে হাসিয়া বলিয়াছিল, বহুকাল পরে পিত্রালয়ে যাইবার সুযোগ পাইলাম। কথাটা মিথ্যা বলে নাই, ওর হাসিটি কপট বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাইবার পূর্বে গৃহদেবতাকে এবং গুরুজনদের প্রণাম করিয়া, আমাকে একলা ঘরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছিল। বলিয়াছিল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, শুভ কাজ যেন মঙ্গলমত হয়। তুমি সুখে থাকিও সুস্থ থাকিও। পিতার বিবাহ পুত্রের দেখিতে নাই। নাটু ও পুত্রবধূ তোমার ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিবে। ফিরিয়া আসিলে উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। আমাকে এক বছরের আগে এখানে আনিও না।

'আমি তাহার সকল কথা মানিয়া লইলেও এক বছরের অঙ্গীকার করিতে পারি নাই। বলিয়াছিলাম, যথাসময়ে তোমাকে আনিবার ব্যবস্থা করিব। এক বছর কিংবা দুই বছর অথবা দুই মাস, তাহা আমি স্থির করিব। প্রণামের পরে

তাহাকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিয়াছিলাম। সে শিথিল ঠোঁটে প্রতিদান দিয়াছিল। মুখ আরক্ত হইয়াছিল। চেষ্টা করিয়াও চোখের জল রোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু যাইবার শেষ মুহূর্তে বলিয়া গিয়াছিল, আবার যখন ফিরিয়া আসিব তখন আর আমাকে চুম্বকী বলিয়া ডাকিও না।

'যাইবার পূর্বে ইহাই তাহার শেষ কথা ছিল। আমাকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল।'



'পক্ষকাল পরে, লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলাম। ইন্দুমতীর শয়ন ঘর বন্ধ ছিল। লক্ষ্মণার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইস্টক নির্মিত ঠাকুর দালানের সংলগ্ন বিপরীত দিকে যে ইস্টক নির্মিত গৃহ ছিল পিতামহ তাহা আমাকে দিয়াছিলেন। উহাতে দরদালান সহ চারটি ঘর ছিল। বাড়ির অন্দরে তাহা ছাড়া চারটি দোচালা ও চারচালা বাংলা ঘর ছিল। সবই শয়ন ও বাসের জন্য। মা নিজে একটি দোচালা বাংলা ঘরে থাকিতেন। নাটুকে পাকা ঘরের একটি দেওয়া হইয়াছিল। বাকি তিনটি আমার ছিল। মা চাহিয়াছিলেন, ইন্দুমতীর ঘরে লক্ষ্মণাকে রাখিবেন আর ইন্দুমতীকে একটি চারচালার ঘরে পাঠাইবেন। আমি মায়ের কাছে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম অবশ্যই লক্ষ্মণার অজ্ঞাতে। পাশাপাশি তিনটি পাকা ঘরের মাঝেরটি খালি রাখিয়া পাশের একটি ঘরে লক্ষ্মণার শয়ন ঘর সাজানো হইয়াছিল।

'মা যথেষ্ট আদর করিয়া লক্ষ্মণাকে বরণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, আমার বেদোর স্ত্রীভাগ্য ভাল। এই বধূটিও রূপে কিছু কম নহে। বরং ইহার রূপে খরতা নাই, 'লক্ষ্মীশ্রী' আছে। তবে যেহেতু লক্ষ্মণার তের বছর বয়স হইয়াছিল সেই হেতু মা পূর্বেই একটি প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কারণ রজঃ দর্শনের পরে লক্ষ্মণার বিবাহ হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটিতে পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মূলতঃ স্ত্রী-আচার, স্বল্পক্ষণের অনুষ্ঠান ছিল। আমি কাছে না থাকিলেও জানিতাম লক্ষ্মণাকে সেই অনুষ্ঠানে বহুতর অশ্লীল কথা-বার্তা বলিয়া ঠাট্টা করা হইয়াছিল। শ্যামকান্তির স্ত্রীরা কালরাত্রিতেই ইন্দুমতীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মণাকে নানা কথা বলিয়াছিল। তাহার মনে ঈর্ষা জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

'আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, লক্ষ্মণা প্রথম রাত্রেই আমাকে সেই সব কথা বলিয়াছিল। তাহার আচরণে নববধূর সলজ্জ কুণ্ঠা থাকিলেও কথাবার্তায় সহজ ছিল। পিত্রালয়ে সে কিছু ব্যাকরণ, শাস্ত্র ও কাব্য পাঠ করিয়াছিল। মা ঠিকই বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণার রূপে খরতা ছিল না কিন্তু সে দেখিতে সুশ্রী

ছিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা না হোক, সুগৌরী আরক্ত চক্ষু উন্নত নাসা স্বাস্থ্যবতী ছিল। বাইরের প্রকৃতিতে তাহাকে গম্ভীর দেখাইলেও সে ছিল পরিহাসপ্রিয় বুদ্ধিমতী। সে প্রথমেই আমার চরিত্রটি বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমার প্রয়োজন অপ্রয়োজন ভাল মন্দ জানিয়া লইয়াছিল।

'শাস্ত্রে কহে স্ত্রীলোককে পূর্ণ বিশ্বাস করিতে নাই। স্ত্রীরা কহে, পুরুষকে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। উহারা স্বাধীন। শাস্ত্রের কথা সকলই অসার। নরনারী কে কী পরিস্থিতিতে কী রূপ আচরণ করে তাহা সকলই নির্ভর করে তাহার চারিত্রিক গঠনের মধ্যে। লক্ষ্মণাকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ভাবের গাঢ়তা জন্মাইতে দেরি হয় নাই। তাহার অহংকার ছিল না লোভ ছিল না, অন্তরটি সরল ছিল। সে অল্প কালের মধ্যেই আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমিও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। উভয়েই পরস্পরকে পাইয়া সুখী হইয়াছিলাম।

'প্রথম কয়েক মাস আমি সকল কাজকর্ম ভুলিয়া লক্ষ্মণার সঙ্গলাভের জন্য অতি মাত্রায় ব্যাকুল হইতাম। নতুন প্রেমের মত্ততায়, আমি লোকচক্ষুর কথা ভুলিয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতাম। যখন তখন অন্দরে আসিতাম। প্রয়োজন না থাকিলেও লক্ষ্মণা যেখানে থাকিত সেখানে উপস্থিত হইতাম। লক্ষ্মণা লজ্জা পাইত। ঘোমটা টানিয়া মুখ আড়াল করিত। দাসীরা দ্রুত সরিয়া যাইত। লক্ষ্মণাও সরিয়া যাইতে বিলম্ব করিত না। কেবল ঠোঁট টিপিয়া চোখের ইশারা করিয়া যাইত। রাত্রে দেখা হইলে সে আমাকে ঐ রূপ করিতে বারণ করিত। কিন্তু সে মনে মনে সুখী হইত। আমি বলিতাম, ইহা আমার দোষ নহে, তোমার। 'তুমি' আমাকে গুণ করিয়াছ।

'লক্ষ্মণা আমার কথা শুনিয়া হাসিত। বলিত, 'আমি গুণ করিতে শিখি নাই। বরং মনে করি তুমিই আমাকে গুণ করিয়াছ।' কে কাহাকে গুণ করিয়াছে ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ বাদানুবাদ হইত। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণাকে আমি কী রূপ গুণ করিয়াছি তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সে লজ্জায় লাল হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। কারণ নিজের অন্তরের ব্যাকুলতার কথা সে ভাঙিয়া বলিতে পারিত না। আমি প্রাণ খুলিয়া তাহার গুণ করিবার নানারকম ব্যাখ্যা করিতাম। সেসব শুনিতে শুনিতে সে আমার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া দিত। আমি সেই মুখ তুলিয়া চুম্বন করিতাম। এইভাবেই তাহাকে আমি গুণিনী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

'লক্ষ্মণা মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিল, মহাশয়ের ব্যাকরণে ভুল হইতেছে। লিঙ্গ বিচারে চুম্বকী যেমন হয় না, তেমনি গুণবতী কখনও গুণিনীও হয় না। তাহার মুখে চুম্বকী নাম শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি কাহারও সামনে ইন্দুমতীকে চুম্বকী বলিয়া ডাকিতাম না। অবশ্য এই রূপ ভাবাও ভুল ছিল। কখন কাহার সামনে হয় তো বলিয়াছি, নিজেরই মনে নাই। চাঁপির মুখ হইতেও প্রচার হইয়া থাকিতে পারে। আমাকে চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া লক্ষ্মণা

অপ্রস্তুত আড়ষ্ট ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন আর সে আমাকে আপনি সম্বোধন করিত না। আমিও আপনি সম্বোধন পছন্দ করিতাম না। সে অপরাধীর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাগ করিলে!

'আমি তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিয়াছিলাম, না রাগ করি নাই। তোমার মুখে নামটা শুনিয়া অবাক হইয়াছিলাম। হ্যাঁ, নাটুর মাকে আমি চুম্বকী বলিয়া ডাকি। আর এখন হইতে তোমাকে গুণিনী বলিয়া ডাকিব। তোমার ব্যাকরণ জ্ঞান এখানে কাজে লাগিবে না। ইহা অন্তরের সম্বোধন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। ব্যাকরণ গোল্লায় যাক। লক্ষ্মণা হাসিযা বলিয়াছিল, ব্যাকরণের কথা নিতান্তই কথার কথা, আদরের ডাক নামে কে কবে ব্যাকরণের কথা ভাবিযাছে। আমি আজ হইতে তোমার গুণিনী হইলাম। তবে তুমি প্রাণের যে তাগিদে এই নাম রাখিলে, তাহাই যেন বিশ্বাস করিও। এ সৌভাগ্যের গুণ যেন কখনও কু বা কুহক চিন্তা করিও না।

'লক্ষ্মণার চিন্তা ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট দূরদৃষ্টি প্রকাশ পাইত। ইহা তাহার বয়স ও শিক্ষার ফল। আমি তাহাকে লইয়াও প্রায়ই পাশা খেলিতে বসিতাম। সে ভাল পাশা খেলিতে জানিত না। শিখাইতে চেষ্টা করিতাম। তারপরে সে একদিন নিজেই বলিয়াছিল, আমি প্রেমারা খেলিতে জানি। শুনিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও খুশি হইয়াছিলাম। প্রেমারা (পর্তুগীজদের তাস খেলা) আমি বাহিরে অন্যদের সঙ্গে খেলিতাম। ইন্দুমতীর প্রেমারা ভাল লাগিত না। দুই-জনের পক্ষে চল্লিশটি তাস লইয়া খেলারও অসুবিধা ছিল। আমার কাছে প্রেমারার চল্লিশ গোছাই ছিল। আঁশ যুক্ত মোটা কাগজের উপর শাটি বস্ত্র দিয়া তৈরি অঙ্কিত প্রেমারার তাস আমাকে মুর্শিদাবাদের বেজাখাঁর সম্পর্কে দৌহিত্র ফিরোজ দিয়াছিল।

'ইন্দুমতীর পক্ষে প্রেমারার বিবিধ নাম মনে রাখা বিরক্তিকর বোধ হইত। অথচ লক্ষ্মণা সহজেই জাতুর ত্রেফ দোশ উ' কেরোন্তা দিবর ইত্যাদি অনর্গল বলিতে পারিত। দুইজনে খেলিতে গেলে বাকি দুজনকে কল্পনা করিয়া, তাহাদের চাল আমাদের দুইজনকে দিতে হইত। এই খেলার মধ্যে প্রতিটি তাসের হিসাব রাখিতে হইত এবং ভাবিয়া চিন্তা করিয়া প্রেমারা খেলিতে হইত। লক্ষ্মণা খেলায় এত তন্ময় হইয়া যাইত তাহার আর কিছুই মনে থাকিত না। এবং অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্মণার জয় হইত। জিতিবার পরে সে আমার ভুল গণনাগুলি দেখাইয়া দিত। পাশা বা প্রেমারা যাহাই হউক, জুয়ায় আমি কোনকালেই জিতিতে পারি নাই। কি বাহিরে, কি ঘরে। ইন্দুমতীর কাছে পাশায় হারিতাম। লক্ষ্মণার কাছে প্রেমারায়।

'লক্ষ্মণা জিতিলে ইন্দুমতীর মত হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত না। মুখের সামনে প্রেমারা তুলিয়া চোখ বুলাইত, মিটি মিটি হাসিত। আমার ভুল চাল দেখিলেই সে হতাশাসূচক শব্দ করিয়া উঠিত এবং বলিযা উঠিত তুমি মোটে হিসাব রাখিয়া খেল না। ইতিপূর্বে কাতুর (সাত ছক্কা পাঞ্জা) খেলিয়াছিলে আমি কেরোন্তা (সাত ছাফিরবু অর্থাৎ সাহেব বিবি গোলাম) দিয়া জিতিয়া ছিলাম।

তার আগে নিজেই কেরোস্তা একবার খেলিয়াছিলে। দুই হাত দেখিয়া খেলিতেছ। জানা উচিত ছিল বাকি ফিবরু সবই আমার হাতে রহিয়াছে। একবার ভাল করিয়া ফরাস টানিয়া লও, আমি তামাকু সাজিয়া দিতেছি। না হইলে তোমার মগজ সাফ হইবে না। বলিয়া হাসিতে হাসিতে পাতাগুরিতে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ করিয়া উঠিয়া যাইত। আমাকে তামাকু সাজিয়া দিত। ঐ সময়ে তামাকু সাজিবার জন্য অন্য কাহাকেও ডাকা হইত না।

'আমি বারে বারে হারিতে থাকিলে, লক্ষ্মণার উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিত, তোমাকে কবে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। তাহাব ধারণা ছিল, আমি কাজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া হারিতাম। তাহা ঠিক নহে, যদিও আমাকে প্রায়ই মুরশিদাবাদ যাইতেই হইত। আমি মুরশিদাবাদ গেলে, লক্ষ্মণার মন খারাপ হইত। সে আমাকে কালিদাসের মেঘদূত হইতে বিরহের শ্লোক পড়িয়া শুনাইত। তাহার আচরণে হাস্য লাস্য চটুলতা সকলই ছিল কিন্তু অতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিত না। ইন্দুমতীর মধ্যে অতি উচ্ছ্বাসের আচরণ প্রকাশ পাইত। তাহাতেই উহাকে মানাইত। লক্ষ্মণাকে নিজের আচরণে যথার্থ মানাইত।

'মুরশিদাবাদে যাইতে ক্রমেই আমার উৎসাহ কমিয়া আসিতেছিল। লক্ষ্মণাব জন্য নহে, কাজের জন্যই ক্রমে মুরশিদাবাদে যাওয়া আমার কাছে বিরক্তিকর বোধ হইত। লক্ষ্মণাকে তাহা বলিতাম। মাঝে মাঝে সে ইন্দুমতীকে আনিবার কথা বলিত। বুঝিতাম সে মনে মনে সন্দেহ করিত আমি ইন্দুমতীব জন্য অন্য-মনস্ক থাকি। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আমি প্রেমারায় লক্ষ্মণার সঙ্গে বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তবে ইন্দুমতীকে ভুলিযা যাই নাই। প্রায়ই তাহার কথা মনে হইত। একাদিক্রমে তাহার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি। ফলত, লক্ষ্মণার সঙ্গে তাহার প্রকৃতিগত মিল অমিলের প্রসঙ্গ মনে আসিত। লক্ষ্মণাকে তাহা কখনও বলিতাম না। বরং হাসিয়া বলিতাম, সপত্নী দর্শনের জন্য কোন স্ত্রীকে এমন ব্যগ্র দেখি না। লক্ষ্মণাও হাসিয়া জবাব দিত, হ্যাঁ আমি ব্যগ্রই বলিতে পার। আজ না হউক কাল তাঁহার সঙ্গেই আমাকে সংসার করিতে হইবে। তবে আর বেশি দেরি করিয়া কী লাভ। তোমার কি চুম্বকী দিদি ঠাকরুণকে কাছে পাইতে ইচ্ছা করে না!

'লক্ষ্মণার মুখে চুম্বকী দিদিঠাকরুণ নাম এবং আমাকে পালটা জিজ্ঞাসা শুনিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতাম। লক্ষ্মণার সঙ্গে এক বছরের মধ্যেই এমন একটি সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল সহজে তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করা সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট জবাব না দিলেও, সে অনেক কথাই বুঝিতে পারিত। সে বুদ্ধিমতী ছিল। বলিতাম, হ্যাঁ চুম্বকীকে দেখিতে ইচ্ছা হয় বৈকি। তবে গুণিনী এমন গুণ করিয়া রাখিয়াছে আপাততঃ চুম্বকীকে না হইলেও চলিবে। লক্ষ্মণা বলিত, আমি এমন গুণিনী হইতে চাহি না। ইহা অনর্থের কথা।

'প্রকৃতপক্ষে আমার মনোগত বাসনা ছিল অন্যরকম। আমি সুখ ও স্বস্তি দুইই চাহিয়াছিলাম। সেই জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম লক্ষ্মণা যখন আমার

কাছে থাকিবে, ইন্দুমতী তখন পিত্রালয়ে থাকিবে। ইন্দুমতী কাছে থাকিলে লক্ষ্মণা পিত্রালয়ে থাকিবে। একদিন লক্ষ্মণাকে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। লক্ষ্মণা বিমর্ষ হাসিয়া বলিয়াছিল পত্নীরা সকলেই স্বামীকে চাহে। কুলীনের স্ত্রীরা অনেকেই সারা জীবন পিত্রালয়ে থাকিয়া যায়। তোমার ক্ষেত্রে সেরূপ হওয়ার কোন কারণ নাই। তুমি সপত্নী কোন্দলের ভয়ে চুম্বকী দিদিঠাকরুণের সঙ্গে আমাকে এক সঙ্গে সংসার করিতে দিতে চাহিতেছ না। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার ভয় অমূলক। তা ছাড়া এইরকমটি চিরকালের জন্য চলিতে পারে না। আমি দিদির সম্পর্কে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে আমার মনে কোনরকম দুশ্চিন্তা নাই।

'আমি মনে মনে হাসিয়াছিলাম। আমার ভয় অমূলক, এরকম বিশ্বাস করিতাম না। তবে ইহা বিশ্বাস করিতাম ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণার মধ্যে ঈর্ষা বিরোধ যাহাই থাকুক তাহাকে কখনও সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করিতে দিব না। লক্ষ্মণাকে বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিব। লক্ষ্মণা হাসিয়া বলিয়াছিল, ইহা স্তোক বলিয়া মনে হইতেছে। ভাবিবার কিছু নাই। তোমার গুণিনী চুম্বকীকে গুণ করিবে আর চুম্বকী গুণিনীকে আকর্ষণ করিবে। আমি অট্ট হাসিয়া বলিয়াছিলাম, আর বৈদূর্য্য বন্দ্যোঃ ব্যাটা আমের আঁটির ন্যায় গড়াগড়ি যাইবে। লক্ষ্মণা হাসিয়া বলিয়াছিল, তা হইলেও হইতে পারে।

'লক্ষ্মণাকে বিবাহের পূর্ণ এক বছর পরে সে গর্ভবতী হইয়াছিল। এক বছর তিন মাস পরে সে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই ইন্দুমতীকে আনিবার দিনক্ষণ স্থির হইয়াছিল। আমি মুরশিদাবাদ চলিয়া গিয়াছিলাম। পক্ষকাল পরে ফিরিয়া, ইন্দুমতীকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। পঁচিশ অতিক্রম করিয়া ছাব্বিশ বছরের ইন্দুমতী যেন নতুন যৌবন ও রূপ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আদৌ প্রোষিতভর্তৃকার ন্যায় শীর্ণ ক্লিন্ন দেখি নাই। এক বছর তিন মাস পরে তাহার সঙ্গে রাত্রে সাক্ষাতের সময় সে আমাকে প্রণাম করিয়াছিল। উভয়ে উভয়কে পা হইতে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। ধৈর্যের বাঁধ আমারই আগে ভাঙিয়াছিল। আমি ইন্দুমতীকে দুই হাতে টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলাম, সাপ কি খোলস ছাড়াইয়া নতুন রূপে লইয়া আসিল।

'ইন্দুমতী নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিয়াছিল, এক প্রকার তাহাই বলিতে পার। তবে এ সাপের বিষ নাই। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিলাম, তোমাকে সাপ বলি নাই। তোমার স্বাস্থ্য দেখিয়া বলিয়াছি। বিষ কোথায়, তুমি তো সুধারসের ভাণ্ড। ইন্দুমতী হাসিয়া বলিয়াছিল, এত তাড়াতাড়ি কথাটা বলিও না। এখনও এক সুধারসে তোমার আকণ্ঠ ভরিয়া রহিয়াছে। ইহা হয় তো তাহারই উদ্গার। না হইলে মুরশিদাবাদ হইতে ফিরিতে এত দেরী করিতে না। এখন স্থির হইয়া দাঁড়াও, তোমাকে একটু ভাল করিয়া দেখি। বুঝিয়াছিলাম ইন্দুমতীকে আনিতে পাঠাইয়া আমার মুরশিদাবাদ যাওয়াটা তাহার চোখে অন্য রকম ঠেকিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, আমি লক্ষ্মণার বিরহ ঘুচাইতে এবং তাহার প্রতি

বিমুখতাবশতঃ মুরশিদাবাদ চলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার পক্ষে এইরূপ ভাবাই হয় তো স্বাভাবিক। তথাপি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, মুরশিদাবাদে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ওখানে পক্ষকাল কাটিয়া যাইবে ভাবি নাই। তুমি ভালই জান আমার আর মুরশিদাবাদে যাইতে ইচ্ছা করে না। এখন আর নবাবের কাজে পেটও ভরে না, ইজ্জতও নাই। ইন্দুমতী বলিয়াছিল, তাহাই হয় তো হইবে। আমারই কপাল মন্দ, আসিয়া তোমার দেখা পাই নাই। তবে দেখিতেছি এ বাড়ির বড় কর্তা দাদার চেহারাটি আরও মোহনীয় হইয়াছে। না হইবার কোন কারণ নাই। শুনিয়াছি আমার অল্প বয়সী সপত্নীটি দেখিতে খুবই সুন্দরী, সেবা-পরায়ণা। সকলের মুখে তাহার গুণগান। সে পাশা খেলিতে জানে না, প্রেমারায় বাঁধিয়াছিল।

'ইন্দুমতীর কথা শুনিয়াই বুঝিয়াছিলাম কোন কথা শুনিতেই তাহার বাকি নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলাম, নেশা করিলে খোয়ারি কাটাইতে হয়। আমার পাশার জুটি চলিয়া গিয়াছিল, প্রেমারায় তাহাই ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইন্দুমতী তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, প্রেমারা দিয়া পাশা ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা? সর্বনাশ, আমাকে ভুলিয়া যাও নাই তো! পাশার জুটি মন হইতে মুছিয়া যায় নাই তো। আমি আবার তাহাকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বলিয়াছিলাম, চুম্বকী নর্দবাজীনী। পাশা আগে, প্রেমারা পরে। তুমি আমার আসল নেশা। খোয়ারি কাটানো অন্যটি কিঞ্চিৎ অধিকন্তু। তোমাকে কখনও ভুলিতে পারি!

'এইরূপ অবস্থায় সকল পুরুষকেই চাটুবাক্যের আশ্রয় লইতে হয়। অবশ্য যদি প্রকৃতই আকর্ষণ থাকে। মিথ্যাও কিছু বলি নাই। সন্দেহ কি ইন্দুমতী বিশ্বাস করে নাই। কোন রমণীই বিশ্বাস করে না। ইন্দুমতী বলিয়াছিল, আমার সৌভাগ্য ভুলিয়া যাও নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার পিত্রালয়ের অন্নজলে কী বিশেষ গুণ আছে। তোমার রূপ ও স্বাস্থ্য যে নতুন প্রভা ছড়াইতেছে। ইন্দুমতী বলিয়াছিল, ইহা তোমার দৃষ্টির ভ্রম, মনের বিভ্রম। আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি।

'যাহা হউক, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার আর ইন্দুমতীর মধ্যে পূর্বের প্রণয় প্রীতি ফিরিয়া আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে সে লক্ষ্মণার কথা তুলিত। সে সবই শুনিয়াছিল, কেবল লক্ষ্মণার গুণিনী নামটি শোনে নাই। আমিও বলি নাই। ইতিমধ্যে নাটুর আর একটি বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। নববধূটি ফুলিয়ার কুলীন ঘোষাল পরিবারের এবং ইন্দুমতীর বাল্য সখীর কন্যা। এ বিবাহের প্রস্তাবটি সে আমার মা বাবাকে দিয়াছিল।

'দেখিতে দেখিতেই এক বছর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মণাকে পাঁচ মাসের পুত্র কোলে সহ শ্বশুরালয়ে আনা হইয়াছিল। আশঙ্কা করিয়াছিলাম আমার সুখ স্বস্তি দুই-ই নষ্ট হইবে। অবশ্য ইহা লইয়া কোন পুরুষই ভাবিত হয় না। আমারও ভাবিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সংসারে সকল পুরুষের

মন একরকম হয় না। এই বিষয়ে আমি কিছুতেই উদাসীন হইতে পারিতাম না।

'সৌভাগ্যবশতঃ, লক্ষ্মণা মিথ্যা বলে নাই। তাহার সঙ্গে ইন্দুমতীর সম্পর্ক অল্প দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা যথার্থ কাহার গুণে বলিতে পারি না। তবে লক্ষ্মণা ইন্দুমতীর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আমার অপেক্ষা ইন্দুমতীই যেন তাহার অধিক প্রিয়। গুণিনী নামটি সে নিজেই ইন্দুমতীকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। আর ইন্দুমতী লক্ষ্মণার সামনেই আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। লক্ষ্মণাকে একান্তে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন বলিলে। সে উত্তর দিয়াছিল, বলিতে হয়। তুমি রাগ কর নাই তো।

'আমি রাগ করি নাই। তবে ইন্দুমতীকে আমি নিজে বলিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। লক্ষ্মণার বলিয়া দিবার কারণটিও স্পষ্ট। সে ইন্দুমতীর মন জয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এ লক্ষণটি ভাল। উভয়ের মধ্যে নিঃশব্দে একটি বিবাদের স্রোত বহিতে থাকিবে তাহা হইতে ইহা মন্দের ভাল। লক্ষ্মণার বয়স কম হইলেও সে বুদ্ধিমতী। শান্তি বজায় রাখিবার সমস্ত রকম চেষ্টা করিত। ইন্দুমতীও কোন অংশে কম বুদ্ধিমতী নহে। সে সবই বুঝিত, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও লক্ষ্মণাকে দূরে সরাইয়া রাখার উপায় ছিল না। আমি লক্ষ্য করিতাম, উহাদের তাহা বুঝিতে দিতাম না। ইন্দুমতী লক্ষ্মণার শিশুপুত্রটিকে প্রায়ই নিজের হাতে স্নান করাইত, খাওয়াইত, সাজাইত। লক্ষ্মণাও সবুকে—অর্থাৎ ইন্দুমতীর আড়াই বছরের তৃতীয় পুত্র সবিতাকান্তিকে সর্বদা নিজের হাতে খাওয়াইত পরাইত, কাছে কাছে রাখিত। আমার মায়ের বা বালিকা পুত্রবধূদেরও ইহা ভাল লাগিত না। অপর স্ত্রীলোকদের তো কথাই নাই।

'দ্বিপ্রহরের অবকাশে মাঝে মধ্যে আমাদের যে খেলা চলিত তাহা বন্ধ হয় নাই। কিন্তু জোড়া ভাঙিয়া তিনজন হইয়াছিলাম। উহাতে পাশা বা প্রেমাবা কোনটাই খেলা যাইত না। ভবতারণ খুড়ার বিবাহের সংখ্যা সাত। সংসার ছিল তিনটি। বাকি স্ত্রীদের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে সাক্ষাত হইত। তিনজনের মধ্যে একজন ইন্দুমতীর বয়সী। সে প্রায়ই আমাদের বাড়ি যাতায়াত করিত। সেই খুড়িটিকেই আমাদের খেলার জুটি করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সে সপত্নী নিন্দায় যথেষ্ট মুখর হইলেও আমাদের সঙ্গে মিশিতে পছন্দ করিত। সে নানারকম হাসি ঠাট্টা কৌতুক ও গল্প করিত। কিন্তু আমি খুড়িটিকে ভয় পাইতাম। সে সুযোগ পাইলেই ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণার সঙ্গে বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা করিত। বশীকরণের কথাও বলিত। আমি তাহা ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণার কাছ হইতেই শুনিতাম।

'যাহা হউক, আমাদের খেলা বন্ধ হয় নাই। কোন কোন দিন রাত্রে দেখিতাম হয় তো লক্ষ্মণার শোবার ঘরে, ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণা শুইয়া রহিয়াছে। অথবা ইন্দুমতীর ঘরে লক্ষ্মণা। আমি উপস্থিত হইলেও তাহারা নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকিত। কখনও বলিত, আজ আমরা এক সঙ্গে শুইব তুমি অন্য ঘরে যাও। ইহাও তাহাদের এক প্রকারের রসিকতা। আমিও তথাস্তু বলিয়া যখন যাহার ঘর খালি থাকিত তাহার ঘরে গিয়া শুইতাম। খেলাটির মধ্যে আসল কৌতুক ছিল যাহার

শূন্য শয্যায় গিয়া আমি শুইতাম. সেই রাতে তাহারই সঙ্গে আমার রাত্রিবাস হইত। কারণ যাহার ঘর সে কিছুক্ষণ বাদেই ফিরিয়া আসিত। আমি যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, ফিরিয়া আসিলে কেন। উত্তর পাইতাম, তোমাকে ঘুম পাড়াইতে আসিয়াছি।

'কিন্তু যে যাহাই করুক উভয়ের মধ্যে যতই প্রীতির সম্পর্ক থাকুক, বুঝিতে পারিতাম পরস্পরের মধ্যে অন্তঃস্রোতে একটি দ্বন্দ্ব ছিলই। সম্ভবতঃ ইহা প্রকৃত-গত। কোন দিন দেখিতাম ইন্দুমতী ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণার মুখ থম্‌থমে হইয়া রহিয়াছে। আমি তুষ্ণীম্ভাব লইয়া থাকিতাম। তাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতাম না। ইন্দুমতী যখন পাশার শারি লইয়া দুই হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করিত, তখন সে দান চালিবার পূর্বে ঠোঁট ও চোখের ভঙ্গি করিয়া আমার দিকে চাহিত। লক্ষ্মণাও প্রেমারায় বসিয়া দাদ্‌বেল (যে তাশ বাটে) হইয়া, তাশ বন্টনের পূর্বে সকলের অলক্ষিতে একবার আমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিত। এ সকলের একটাই বক্তব্য। যে জিতিবে, আমি সেই রাত্রিটি তাহার ঘরে যাপন করিব।

'আমার বহুতর কাজের মধ্যে, এই সব অবকাশ কম আসিত। তবুও জীবন যাপনের মধ্যে, এই সব ক্ষুদ্র বিষয় আমার মনকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিত।'



'রাত্রি পোহাইল। সারা রাত্রে বারে বারেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। শ্যাম-কান্তি ও ভবতারণ খুড়াকে বিশ্বাস ছিল না। দুযার প্রতিই নির্ভর করিয়াছিলাম। নিদ্রা আসিলেও বারে বারেই স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। অধিকাংশ স্বপ্নই ইন্দুমতী আর লক্ষ্মণাকে লইয়া। কখনও দেখিতেছিলাম তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেছি। কখনও কৌতুক রঙ্গ রসে গল্প করিতেছি। কখনও মাকে দেখিতেছিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারে স্বপ্নের মধ্যেই চোখে জল আসিতেছিল। চাহিয়া দেখিতেছিলাম, দুযা ও দুই পাইক এবং পরমেশ ভট্টাচার্য বসিয়া রহিয়াছে। একটি প্রদীপ এক পাশে জ্বলিতেছে।

'লক্ষ্মণার এখন তেইশ বছর বয়স হইয়াছে। ইন্দুমতীর চৌত্রিশ। উভয়কে লইয়া আমি কী রূপ সুখে ছিলাম, স্বপ্নগুলি যেন বারে বারে তাহাই দেখাইয়া দিতেছিল। আর কষ্ট বোধ হইতেছিল। কাজের স্বপ্নও দেখিতেছিলাম। কিন্তু গৃহের স্বপ্নই বেশি। ইহাতে বোঝা যাইতেছিল সংসারের প্রতি আমার আকর্ষণ কত অধিক। ইদানিং আমি মুর্শিদাবাদ যাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্য-বশতঃ নায়েবী সুবাদারের রাজস্ব বিভাগের কাজে কোন ত্রুটি না রাখিয়া সসম্মানেই ইস্তফা দিযাছিলাম। ইহা বড় শক্ত কাজ। সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

ইংরাজের বেতনভোগী সুবাদারকে জমিদারের ন্যায় ইংরাজদের বহু টাকা নজরানা দিতে হইত। পরগণায় পরগণায় ঘুরিয়া সেই টাকা আমাকে শ্যামকান্তিকে ও আরও অনেককে সংগ্রহ করিতে হইত। রাজস্ব বিভাগের কাজে ইস্তফা দিবার পরে নিজেদের আড়াইখানি তালুকের স্বত্ব রক্ষার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইতেছিল। ইংরাজরা তালুকের খাজনা ক্রমেই বাড়াইতেছিল। তথাপি মুরশিদাবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, বিশেষ স্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম। তালুকের নিজের অংশ দেখা শোনা করিয়াও আমার অবকাশ বাড়িয়াছিল। অতএব গৃহে অবকাশ যাপনের সময়ও বেশি পাইতাম। সেই কারণে লক্ষ্মণা ও ইন্দুমতীর সঙ্গও বেশি হইত। নিদ্রার মধ্যে তাহাদের স্বপ্নই বারে বারে দেখিতেছিলাম।

'স্বপ্নের মূল কারণটি আমার অন্তরের মর্মান্তিক হতাশা। স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া কয়েকবারই গলায় ও হাতের আঙ্গুলে স্পর্শ করিয়াছি। আঙ্গুলে আংটি বা গলায় মৃত্যুঞ্জয় সোনার হার যুক্ত মাদুলিটি ছিল না। না থাকিবারই কথা। যে মরিতে যাইতেছে তাহার অঙ্গে ভূষণ কেহ রাখে না। তবে মৃত্যুঞ্জয় মাদুলিটিকে হার মানাইয়া আমি আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছি। এখন আমাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ বাঁচিয়া ওঠা আদৌ সুখের নহে। একদিকে বাঁচিয়া উঠিবার প্রাণপণ প্রয়াস, অন্য দিকে ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতি, এ সবই আমাকে সারা রাত্রি বিচলিত করিয়াছে। আর স্বপ্ন দেখিয়াছি। এ অবস্থার মধ্যেও আমি ভুলি নাই মল্লঘরের এক কোণে, পাথর বাটিতে কাঁচা দুধের মধ্যে আমার দুটি আংটি ও মৃত্যুঞ্জয় মাদুলির হার রাখা ছিল। উহা ঘরে পৌঁছিয়াছে তো? অপরের হাতে পড়ে নাই তো? জাগিয়া উঠিয়া দুয়াকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। এখন আমি সকল জিজ্ঞাসার বাহিরে। তবে দুয়া আমার সহসা অসুস্থতায় যতই ব্যস্ত হইয়া পড়ুক অন্য দুই পাইকের নজর ফাঁকি দিবার উপায় কাহারও ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে ভবতারণ খুড়াই এক মাত্র ব্যক্তি। সম্ভবতঃ সে তাহা নিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য পাথর বাটিতে কাঁচা দুধের মধ্যে, জ্যোতিষীর বারণে ধারণ করা আংটি কবচ মাদুলি ডুবাইয়া রাখাই নিয়ম। অন্যথায় উহা অশুচি হওয়ার সম্ভাবনা।

'রাত্রি পোহাইয়া দিনের আলো ফুটিবার অনেক আগে হইতেই, ঘাটে স্নানার্থীদের নানা কলরব উচ্চৈস্বরে মন্ত্রপাঠ মাঝি মাল্লাদের হাঁকডাক চিৎকার শুনিতেছিলাম। তাহার মধ্যেই পাখিদের কলরব শ্মশানযাত্রীদের হরিধ্বনিও কানে আসিতেছিল। রমণী-পুরুষ-শিশুর কান্না হাসি সব মিলিয়া মিশিয়া ত্রিবেণীর ঘাট যেন রাত্রি হইতেই কোলাহলপূর্ণ ছিল। আমি জাগিয়া থাকিয়াও চোখ বুজিয়া ছিলাম। ক্রমে গঙ্গার পূর্বাকাশে রক্তাভা ফুটিয়াছিল।

'আমি নিজেই বাঁশের তৈরি চওড়া চালির বিছানা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। পারিলাম না। দুয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, কী করেন বড়কর্তা দাদা। এই দুর্বল শরীরে আপনি কেমন করিয়া উঠিবেন। আমি বলিলাম, তবে তুই

আমাকে তুলিয়া ধর। আমি ঘাটের দক্ষিণে যাইব। দুযা বুঝিতে পারিল, আমি প্রাকৃতিক কর্ম করিতে যাইব। কিন্তু সে আমাকে স্পর্শ করা উচিত কী না স্থির করিতে পারিল না। নাটু ও ভবতারণ খুড়া আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল। আমি তাহাদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম। নাটু সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উঠিতে পারিবেন? বলিলাম, পারিব। তখন সে ও ভবতারণ খুড়া দুই হাত বাড়াইয়া আমার দুই হাত ধরিল। তাহারা আকর্ষণ করিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল মাথাটা ঘুরিয়া গেল। আমি চোখ বুজিয়া এক মুহূর্ত স্থির রহিলাম। শরীরে কোন কষ্ট নাই, দুর্বল বোধ করিতেছি। উভয়ের কাঁধে হাত দিয়া, ধীরে ধীরে গঙ্গাযাত্রীর ঘাট হইতে বাহির হইলাম। দক্ষিণ দিকে সরস্বতীর ঢালু জমিতে ভ্যারেন্ডা ও আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে গেলাম।

'আমার গায়ে একটি কোঁচকানো নিমাস্তিন (হাফ হাতা পাঞ্জাবী) ও দুর্গন্ধযুক্ত ধুতি কোমরে জড়ানো। অজ্ঞান অবস্থায় মূত্রত্যাগই ইহার কারণ। জঙ্গলের ঢালুতে নামিতে নামিতে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে কবে এখানে লইয়া আসা হইয়াছে। নাটু জবাব দিল, আজ দুই রাত্রি পোহাইল। ইহার অর্থ গতকালই দ্বিপ্রহরে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঘাটে এক রাত্রি অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়াছে। তাহার আগের রাত্রিটি বৈদ্য মুরলীধর আমার চিকিৎসা করিয়া নিদান দিয়াছে। সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই আমাকে নৌকাযোগে এখানে লইয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ পরশু। অথচ যে আঘাতের কারণে জ্ঞান হারাইয়াছিলাম এখন সেই আঘাতের কোন অনুভূতি নাই। বৈদ্য মুরলীধর কী ঔষধ দিয়াছিল, কে জানে। নিদান দিবার পূর্বে আমার মৃত্যুকে নিশ্চিত করিবার জন্য সম্ভবতঃ বিষবড়ি প্রয়োগ করিয়াছিল। যখন আর কোন উপায় থাকে না তখন বিষবড়ি দেওয়াই সাব্যস্ত করা হয়। উহা এক প্রকার অন্ধের করাঘাতের মত। সন্ন্যাস রোগ ভাবিয়া যদি বড়ি প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় আমার বাঁচা মরা সম্পর্কে বৈদ্যও নিশ্চিত ছিল না। অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর কথাই ভাবিয়াছিল। মুরলীধর যখন শুনিবে আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি, সে জিভে দাঁত কাটিয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা গাহিবে। কারণ সে তো নিমিত্ত মাত্র। নিদান ঘোষণা করিলেও বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাতে।

'আমি নাটু ও ভবতারণ খুড়ার অদূরেই জঙ্গলের গোড়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাকৃতিক কর্ম করিলাম। দুযা আসিয়া তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। আমি ইশারায় তাহাকে কাছে ডাকিলাম। ভবতারণ খুড়া তখন নাটুকে নিচু স্বরে বলিতেছিল, আমি পৈতা কানে জড়াই নাই। হাসি পাইয়াছিল। হাসিতে পারি নাই। উহারা এখন আমাকে স্পর্শ করিবে না। আমি দুযার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। জঙ্গলের ঢালুতে নামিয়া, সরস্বতীর ধারে গেলাম। কতগুলি মাল বোঝাই বড় নৌকা ও মাঝি মাল্লারা ছিল। এখনও উহাদের মাল বোঝাই করা বাকি আছে। সরস্বতী দিয়া ইহারা যাইবে না। পূর্বে নাকি এই নদী দিয়াই সপ্তগ্রামে যাইত। তখন ইহা বিশাল ও বেগবতী ছিল। সপ্তগ্রাম হইতে মেদিনী-

পুরের ভিতর দিয়া হাওড়ার কাছে আবার গঙ্গায় যাইয়া মিশিত। এখন দেখিয়া বিশ্বাস হয় না। কিছু পশ্চিমে একটি রজ্জু নির্মিত সাঁকো আছে। উভয় তীরেই ঘন বন। ভিতর দিয়া পথ আছে। বংশবাটি যাইবার সময়, আমরা সাঁকো পার হইয়া জঙ্গলের ভিতরের পথ দিয়া যাইতাম। এই সব পণ্য বোঝাই নৌকা হুগলি সদর অথবা কলিকাতা যাইবে। দুযাকে বলিলাম, তুই আমার হাত ধরিয়া থাক। আমি ডুব দিয়া উঠিতেছি। সে সবলে আমার হাত ধরিয়া রহিল, যেন আমি স্রোতে ভাসিয়া না যাই। কিন্তু এখন যেন আমি তেমন দুর্বল বোধ করিতেছি না। কয়েকটি ডুব দিয়া মনে হইল, শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। নতুন শক্তি ফিরিয়া পাইলাম। কোমর জলে দাঁড়াইয়া নিমাস্তিন খুলিলাম। কোমরের কাপড়টি ধুইয়া আবার জড়াইলাম। ইতিমধ্যে কার্তিকের রৌদ্র উঠিয়াছে।

'দুযার হাত ধরিয়াই ঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। ভিজা কাপড় ছাড়া দরকার। আমি কিছু বলিবার আগেই নাটু অতিরিক্ত মাড় দেওয়া একটি পাড়হীন খুইয়াঁ (খাদি) বস্ত্র দিল। ইহা তাঁতি পাড়ার সংগ্রহ। বুঝিলাম আমার মৃত্যুর পরে শবস্নান করাইয়া ঘৃত মাখাইয়া, এই কাপড়টি জড়াইয়া আমাকে চিতায় তোলা হইত। ইহাই স্বাভাবিক, শবদাহের জন্য সমস্ত সামগ্রীই লইয়া আসা হইয়াছে। আমি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া সেই কাপড়টি কাছা দিয়া পরিলাম। মেঝের উপর বসিয়া প্রথমেই বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। আমি নাটুকে বলিলাম, কেবল দুধ নহে, আমাকে ফল মিষ্টি যাহা পার খাইতে দাও।

'অনুমান করিতে অসুবিধা নাই, নাটুর কাছে নিশ্চয়ই কিছু অর্থকড়ি রহিয়াছে। শ্যামকান্তিও খালি হাতে আসে নাই। নিজেদের খাবার জন্য চাল ডাল রান্নার সরঞ্জামাদিও লইয়া আসিয়াছে। নাটু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটি ভরিয়া দুধ কলা ও ছানা চিনি আনিয়া দিল। নিজেদের সকলের জন্য দই চিড়া গুড় কলাও আনিল। সকলে এক সঙ্গে সকালের খাবার খাইতে বসিলাম। দৃশ্যটি একদিক দিয়া বড়ই সুখের। কিন্তু আমার গলায় খাবার আটকাইয়া যাইতে লাগিল। মনে হইল বুক ভেদ করিয়া একটা শক্ত বস্তু গলার কাছে উঠিয়া আসিতেছে। চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। আমি নিজেকে সামলাইতে চেষ্টা করিলাম। এই ভাবাবেগের আর কোন মূল্য নাই। কেবল নিজের অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ করা হইবে।

'খাওয়া শেষ হইলে, হাত মুখ ধুইয়া সকলেই আমাকে ঘিরিয়া বসিল। সকলের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে। সকলেই আমার মুখ হইতে কিছু শুনিতে চাহিতেছে। আমি গঙ্গার দিকে দেখিতেছিলাম। খাবার খাইয়া সুস্থ বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু এখনও দুর্বলতা কাটে নাই। গতকালও গঙ্গার রৌদ্রোজ্জ্বল জলে চোখ রাখিতে কষ্ট হইয়াছিল। এখন সে কষ্ট নাই। কার্তিক মাসেও জলের রং গৈরিক বর্ণ। পৌষ মাঘ মাসের আগে জলের রং স্বচ্ছ ও নীল হইবে না। আমার বাল্যকালের তুলনায় গঙ্গা ক্রমে অগভীর হইয়াছে। ইংরাজদের ফৌজী বন্দুক জাহাজ আর এদিকে আসিতে পারে না। জল পথে মুর্শিদাবাদ যাইতে

হইলে বজরা করিয়া যাইতে হয়। উহা বিলাসভ্রমণ ছাড়া কাজের জন্য কেহ যায় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে, এ অঞ্চলে কোথাও কোথাও ছোটখাটো চর জাগিয়া ওঠে আরও উত্তরে শান্তিপুরের কাছে আরও বড় চর দেখা যায়। আমাদের গ্রাম হইতে কুন্তী নদী বাহিয়া গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ করিতে আসা একটি বিশেষ আমোদজনক ঘটনা। আবার প্রমোদজনক ঘটনাও বটে। গঙ্গাযাত্রীদেরও কুন্তী নদী দিয়া গঙ্গায় আসিতে হয়। যেমন আমাকেও লইয়া আসা হইয়াছে।

'দেখিতেছি, মৎস্যজীবীদের নৌকা গঙ্গার বুকে তটের নিকটে ভাসিতেছে বাঁশ পুতিয়া কোথাও জাল পাতিয়া রাখিয়াছে। এখনও দু-এক জায়গায় পাতিতেছে। খেয়া নৌকা পারাপার করিতেছে। ভাউলে করিয়া কেহ উত্তরে কেহ দক্ষিণে চলিতেছে। বাতাসের বেগ নাই। পালগুলি মাস্তুলে জড়ানো রহিয়াছে গঙ্গার ওপারে কিছুটা দক্ষিণে কুমারহট্ট-হালিশহরের অংশবিশেষ দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মন্দির চূড়া এবং বৃহৎ অট্টালিকার কিঞ্চিৎ লক্ষ্যে আসে বর্ধমান রাজবাড়ির প্রসাদপুষ্ট ঘোর শাক্ত রামপ্রসাদের সাধনস্থানও ওপারে আকাশে শরতকালের মত শাদা মেঘ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাসিয়া বেড়াইতেছে ক্ষীণ বাতাস এখনও উত্তরগামিনী হইয়া সহসাই যেন স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে ইহাতে অনুমিত হয় হেমন্তকাল উত্তর হইতে শীতের বার্তা লইয়া আসিতেছে এক মাসও অতীত হয় নাই, দুর্গা পূজা হইয়া গিয়াছে। আমাদের বসতবাটি গ্রামটি আমাদেরই তালুক। পূজাও একটিই হইয়া থাকে। শ্যামকান্তি ও আমি পৃথগন্ন হইলেও দুর্গা পূজা উভয়ের মিলিত খরচেই হইয়া থাকে। লোক মারফৎ পত্র দ্বারা সকল আত্মীয়কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করা হয়। কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত বাড়িতে আত্মীয়স্বজন ভরা থাকে। প্রচুর অজা বলি হইয়া থাকে। তথাপি শত্রু বলিদানের প্রতীক স্বরূপ মানকচুর পাতায় ঢাকা একটি চাউলের গুড়ো দিয়া তৈরি পুতুলকে বলি দেওয়া হয়। ইহাতে এক বছর পর্যন্ত শত্রুভয় হইতে মুক্ত থাকা যায়। দশমীর দিন শবরোৎসবটি সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণীয়। এই দিনে সকলে গায়ে কাদা মাটি মাখিয়া গাছের পাতা, পাখির পালক ইত্যাদি দিয়া অদ্ভুত সাজ করে। নৃত্য করে আর পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়। আমাকে কেহ গালি দিলে আমি যদি ফিরিয়া তাহাকে গালি না দিই, তবে আমার পাপ হইবে।

'এইরূপ বিশ্বাস থাকায় শবরোৎসবটি বেশ জমিয়া ওঠে। এক সময়ে আমিও এই উৎসবে যোগ দিতাম। কয়েক বছর যাবত আর দিতাম না। উহা এক প্রকার অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষার প্রতিযোগিতা। যাহা কিছু উৎসব সবই শাস্ত্র স্মৃতি নিবন্ধন হেতু। এই উৎসবে সকলে শবরের ন্যায় সাজে, ঢাকের বাজনার সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া নাচে আর চকার বকার সহ নানা রকম গান করে। কুন্তী নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে এই উৎসবের শেষ। এখনও সবই চোখের সামনে ভাসিতেছে। এইরূপ বলা যাইবে না, কেবল বাগদি হাড়ি ডোম ইহারাই উৎসবের দিন মদ্যপান করে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল কেহই বাদ যায় না। অন্দর-

মহলে আড়ম্বরের সঙ্গে সিদ্ধিপাতার সঙ্গে নানা মশলা মিশাইয়া পানীয় প্রস্তুত হয়। স্ত্রী শিশু নির্বিশেষে, সকলেই পান করে। আমিও করি। বৈদ্য মুরলীধরের তৈরি বিশেষ মাদকদ্রব্যও সেবন করি এবং বলিতে কি মত্ত অবস্থায় একই ঘরের মধ্যে লক্ষ্মণা ও ইন্দুমতীকে লইয়া এইবারও নির্লজ্জ আচরণ করিয়াছি। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সারা রাত্রই পাশা খেলিয়া কাটিয়াছে। তারপরে কয়েকদিন বিশ্রামের পরে দুর্যার সঙ্গে মল্লঘরে গিয়েছিলাম। সেইখান হইতে অজ্ঞান অবস্থায় আজ আমি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে বসিয়া আছি। মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়াছি।

'মল্লক্রীড়ায় বুকের আঘাতে অজ্ঞান হইবার পরে কী কী ঘটিয়াছে, তাহা আমি সবই চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি। উহার বিবরণ জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক। সকলে আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া। কেন আমার মুখের দিকে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে দেখিতেছে, তাহাও জানি। তাহারা আমার কাছ হইতে কিছু শুনিতে চাহিতেছে। কিন্তু আমার কিছু বলিবার নাই। দৈবক্রমে বাঁচিয়া উঠিয়াছি—প্রকৃতপক্ষে ইহা দুর্দৈব এবং আমি তালুক ও সম্পত্তির বড় অংশীদার বৈদূর্য্যকান্তি বন্দ্যোঃ। ইহাদের নিকট বিশেষ প্রতাপশালী ছিলাম। অজ্ঞান অবস্থায় মারিয়া ফেলিবার মনস্থ করিয়াও আমার বাঁচিয়া উঠিবার শক্তি ও ইচ্ছার কাছে পরাজিত হইয়াছে। সকলেই আমার করুণার পাত্র ছিল, এখনও সেইরূপ ভাব দেখাইতেছে। অতঃপর আমি কী করিব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া শ্যামকান্তি ভবতারণ খুড়া ও নাটু। অবশ্যই পরমেশ ভট্টাচার্যও। তাহারা মনে মনে শঙ্কা গণিতেছে। অথচ আমি গতকালই নাটুকে বলিয়াছি, আমি সংসারের অমঙ্গলের কারণ হইব না।

'যে মানুষ একবার গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে সে আর গৃহে ফিরিতে পারে না। ইহাতে সংসারের অমঙ্গল, সকলের অমঙ্গল। তাহাদের কাছে আমার আর কোন অস্তিত্ব নাই। ইহার কোন প্রায়শ্চিত্তবিধিও নাই। চার পাঁচ বছর হইল, ত্রিবেণীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাঁচিয়া থাকিলেও আমার গৃহে ফিরিবার কোন বিধান দিতে পারিতেন কী না জানি না। আমার সংস্কৃত শিক্ষার গুরু ঘনশ্যামও অনেক আগেই গত হইয়াছেন। মুর্শিদাবাদে পারসী শিখিয়া আসিযা ইন্দুমতীকে বিবাহের পরেও আমি আবার তাঁহার কাছে তিন বছর সংস্কৃত পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা ব্যতীত, আজ এমন কেহ নাই যিনি শাস্ত্র ঘাঁটিয়া আমার গৃহে প্রত্যাবর্তনের কোন বিধান দিতে পারেন। তাঁহারাও পারিতেন এমন কোন স্থিরতা নাই।

'কিন্তু সে বিধান পাইলেও, কিছুই করিবার থাকিত না। কারণ আমি জানি কোনো বিধানই আমার পরিবারের জ্ঞাতিবর্গের গ্রামবাসীদের ভয় ও শঙ্কা দূর করিতে পারিবে না। প্রতি মুহূর্তেই তাহাদের মনে হইবে আমি গঙ্গাযাত্রা প্রত্যাগত এক কায়া, অলৌকিক অমঙ্গলের প্রতিমূর্তি। আমাকে দেখিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিবে। আমাকে দেখিয়া দূরে সরিযা যাইবে। গৃহমধ্যে আমার অবস্থান প্রেতের অবস্থান বলিয়া গণ্য হইবে। আমার সংস্পর্শেও কেহ আসিবে না।

জীবিত থাকিয়াও তাহাদের কাছে আমি এক প্রকার মৃত। আমাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, আমি কিছু স্পর্শ করিলেও তাহা বর্জিত হইবে।

'যে চুম্বকী গুণিনী আমার দর্শনমাত্র আপ্লুত হয়, আমাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিলে তাহারাও আতঙ্কে দূরে সরিয়া যাইবে। ইহা আমি কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আমার সঙ্গে রাত্রিবাস দূরের কথা আমার ছায়াও মাড়াইবে না। আর কখনই আমার সঙ্গে তাহারা পাশা প্রেমারা খেলিতে বসিবে না। আমার মাও তাহাই করিবেন। আমাকে দর্শন করাও তাঁহার কাছে অমঙ্গলকর হইবে। নাটু, পুত্রবধূরা আমাকে দেখিয়া পলাইবে। আমার কোমল কচি শিশু-পুত্রবধূদের ও পৌত্রটিকেও আমি আর বুকে লইয়া আদর করিতে পারিব না। প্রকৃতপক্ষে গৃহে আর আমার আশ্রয় মিলিবে না। আমাকে কেহ গ্রহণ করিবে না। অতএব, শাস্ত্রীয় বিধান আদৌ যদি কিছু থাকিয়াও থাকে তাহা কোন কাজে লাগিবে না। এইরূপে অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমনের কোন প্রশ্ন নাই। আমি চির-কালের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছি।

'যাহাদের লইয়া আমার সুখের অন্ত ছিল না, সেই চুম্বকী ও গুণিনীর কাছে এখন আর আমার পূর্বের অস্তিত্ব নাই। অথচ এমন নহে যে, আমি মৃত অতএব তাহারা বিধবা হইবে, বা আমার কোন পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি হইবে। ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণা এখন হইতে বার বছর সধবার জীবন যাপনই করিবে। শাড়ি গহনা পরিধান করিবে, সিঁথায় সিন্দুর, পায়ে আলতা ও প্রসাধনা ইত্যাদি করিবে। মৎস্য ও মাংস আহার করিবে। তারপরেও আমার কোন সন্ধান না মিলিলে, তাহারা বৈধব্য গ্রহণ করিবে। তখন পুত্রেরা আমার শ্রাদ্ধ করিবে। এক্ষেত্রে, এরূপই বিধান। যদি আমি মরিয়াও যাই, সংবাদ না পাইলে, এই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে। আমার জন্য সকলেই কাঁদিবে, কিন্তু আমার অদর্শনে অশঙ্কিত নিশ্চিন্ত থাকিবে।

'আমার গর্ভধারিণী মা রহিলেন। ইন্দুমতী লক্ষ্মণা রহিল, যাহাদের দীর্ঘ-দিন অদর্শনে কাতর হইতাম, দর্শনমাত্র আমার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠিত, স্পর্শমাত্র প্রতিটি রক্তবিন্দু আলোড়িত হইত, তাহারা রহিল। আমার রক্তের পুতুলগুলি রহিল। পিতা গত পাঁচ বছর আগে, সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন, তিনি রহিলেন। আমি জীবন্তে মৃত হইয়া রহিলাম। এই কারণেই শ্যামকান্তি, ভবতারণ খুড়া, এমন কি নাটুও আমার মৃত্যুই চাহিয়াছিল। তথাপি আমি বাঁচিয়া উঠিলাম। ইহা এক মহা দুদৈর্ব। এমনভাবে বাঁচিবার অপেক্ষা মরাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু একবার যখন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিলাম, তখন আর কিছুতেই মরিতে পারিলাম না। সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বাঁচিয়া উঠিলাম। ইহাতেই প্রমাণ হয়, মানুষ কীরূপ প্রাণান্তকর অবস্থাতেও বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। মানুষ মরিতে চাহে না। অথচ জীবিত থাকিয়াও সে তাহার জীবনের নিয়ামক হইতে পারে না। জন্মাবধি ভাবিতাম, আমিই আমার জীবনের নিয়ামক। এখন বুঝিতেছি, অলক্ষ্য নিয়তির নির্দেশে আমি চালিত হইতেছিলাম। এখনও হইতেছি। অমোঘ নিয়তির ক্রীড়নক ছাড়া নিজেকে আর কিছুই মনে হইতেছে

না।

'এখন যাহারা ঘিরিয়া বসিয়া উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু চোখে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, অতঃপর তাহাদের কিছুই বলিবার নাই। অথচ তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না, ভাবিতেছে, আমি কী বলিব। পতিতকে উদ্ধার করা যায়। পিতামহের কাছে শুনিয়াছিলাম, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা পতিত এক ব্রাহ্মণকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বহু পণ্ডিতকে ডাকিয়া বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, জগন্নাথকে ডাকেন নাই। জগন্নাথ নিজেই একশ শিষ্যসহ রাজবাড়িতে অনিমন্ত্রিত হইয়া নিজের ব্যয়ে অবস্থান করেন। রাজা বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যজ্ঞ কীরূপ হইল। জগন্নাথ উত্তর দিয়াছিলেন, যেখানে জগন্নাথ রবাহূত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কী? পরে এই রাজাই একবার জগন্নাথের সাহায্যে বিপদমুক্ত হইয়া, গলায় সোনার কুঠার বাঁধিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

'আমি তো পতিত নহি। গঙ্গাযাত্রা করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছি। মরিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি। অতএব গৃহে প্রত্যাগমনের আর কোন উপায় নাই। আমার নিজের জীবনেই এরূপ ঘটনা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, তাহারা গঙ্গার পূর্ব কূলে গিয়া কোথাও জীবন ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমার সমবয়সী কাহাকেও এইরূপ দেখি নাই। আমার বুক বিদারিত হইতেছে! গৃহের কথা ভাবিয়া দুঃখে ও যন্ত্রণায় অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা প্রকাশ করা নিরর্থক। গত রাত্রে, স্বপ্নের মধ্যে বারে বারেই চোখের জলে ভাসিয়াছি। আর কাঁদিব না। চোখের জল শুকাইয়া তাহা প্রস্তরীভূত হইতেছে। আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। নাটুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি আজই গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাও।

'নাটু আমার প্রশ্নের যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় চোখে অন্যদের মুখের দিকে দেখিল। আমি বলিলাম, যেখানে আমার স্থান নাই, সেখানে আর ফিরিয়া যাইব না। অমঙ্গলের চিন্তার কোন কারণ নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে এখনই ফিরিয়া যাইতে পার। এই কথা শুনিয়া দুযা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, হে বড় কর্তাদাদা, আপনাকে এখানে এ অবস্থায় রাখিয়া আমরা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব?

'দুযা সকল জানিয়াও পূর্বের অবস্থা ভুলিতে পারিতেছে না। আমি যে এখন অতীত মাত্র, সে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। আমি বৈদূর্য্যকান্তি বন্দ্যোঃ, তালুকের অধিকারী, অনেক জমিদারের তুলনায় নিজের সম্মান রক্ষা করিয়া রাজস্বের দাবী মিটাইতে এ পর্যন্ত সক্ষমতা প্রমাণিত করিয়াছি, অথচ সে আমার প্রীতির পাত্র, এ সমস্তই তাহার মজ্জাগত। সে আমার ও তাহার সম্পর্কের পূর্বাবস্থা ভুলিতে পারিতেছে না। তাহার কাতরোক্তি আমার ভাই ও পুত্রের নিকট নিম্নবর্ণের মূর্খের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি বড় দুঃখে মনে মনে হাসিলাম। বলিলাম, কাঁদিস না। ইহাদের সঙ্গে ফিরিয়া গিয়া, তুই পূর্বের

মত নিজের কাজ করিবি, তোর বড় বাপাকে (নাটুকে) সবরকমে আগলাইয়া রাখিবি। তুই জানিস, আমার আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই।

'দুযা তথাপি কাঁদিতে লাগিল। বলিল, আমিই সকল সর্বনাশের মূল। সেই-দিন যদি আপনার সঙ্গে কুম্ভি করিতে না যাইতাম, তাহা হইলে এমন সর্বনাশ হইত না। বড় বাপাকে আপনি নিজের হাতে সমস্ত কাজকর্ম শিখাইয়াছেন, তিনি আপনার সকল কাজই করিতে পারিবেন। আমি আপনাকে ছাড়িয়া আর ফিরিতে চাহি না। আপনি যেখানে যাইবেন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।

'দুযার কথা শুনিয়া আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি নিজেকে শক্ত রাখিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া করুণ মুখে হাসিলাম। দুযা তাহা দেখিল না। সে আপন মনে নিজের কথাই বলিতে লাগিল, সেইদিন পশ্চিমের বাগানে যাইবার কালে, না জানি কী বাধাই পড়িয়াছিল। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় আমার হোঁচট লাগে নাই, ডোম দেখি নাই, চিল উড়ে নাই, কাঠুরেকে কাঠ বহিতে দেখি নাই, মরা গাছে কোকিল ডাকে নাই, বাঁয়ে সাপ ডাইনে শেয়ালও দেখি নাই। তবে কেন এরূপ হইল। বড় কর্তাদাদা, আপনি কি কিছু দেখিয়াছিলেন ?

'ঘর হইতে কোন কাজে বাহির হইলে, যাহা যাহা দর্শনে অমঙ্গল সূচিত হয়, দুযার চোখে তাহা কিছুই পড়ে নাই। আমার চোখেও পড়ে নাই। (আশ্চর্য, টিকটিকির ডাকের কথা নেই!) জন্মাবধি এই সব ঘটনাকে ঘরের বাহিরে যাওয়ার বাধাস্বরূপ মনে করিয়া আসিয়াছি, চিরকাল মানিয়াও আসিয়াছি। দৈব দুর্ঘটনা আমার জীবনেই ঘটিয়াছে। আমার চোখে ছানি পড়ে নাই, তখন দুযার আর কী করিবার আছে। বলিলাম, না আমি সেরূপ কিছু দেখি নাই, উহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। এখন এই দৈবকেই মানিয়া লইতে হইবে। আমি কোথায় যাইব, কী করিব, তাহার কোন স্থিরতা নাই, তোকে পালন করিবার যোগ্যতাও আমার আর নাই। তোর বউ ছেলে মেয়েরা রহিয়াছে, কাজ রহিয়াছে, তোকে ইহাদের সঙ্গেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

'দুযা হাঁটুতে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামকান্তি ভবতারণ খুড়া নাটু সকলেই এখনও আমার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া আছে। আমি নাটুকে আবার বলিলাম, তোমাকে গতকালই বলিয়াছি, আমি সংসারের অমঙ্গলের কারণ হইব না। অকারণ ভয় করিও না, আমি আর গৃহে ফিরিযা যাইব না। গঙ্গাযাত্রা করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছি। এ ক্ষেত্রে আমি আর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও নহি, অতএব হাকিকত লিখিবার প্রয়োজনও নাই। আমি বাঁচিয়া উঠিলাম। কিন্তু সমাজের বিধান অনুযায়ী তোমাদের কাছে আমি এখন মৃত। আমার গৃহে ফিরিবার উপায় নাই। ফিরিলে সকলে আমাকে দেখিয়া ভয়ে শিহরিত হইবে, কেহ আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহার কী-ই বা প্রতিবাদ বিদ্রোহ আছে? নাই, অতএব ইহাই আমার নিয়তি। তোমাদের মঙ্গল হউক। সংসারের মঙ্গল হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। ইচ্ছা করিলে তোমরা এখনই

ফিরিয়া যাইতে পার।

'নাটু কাঁদিয়া উঠিল, আমার পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, আপনি বাঁচিয়া থাকিতেই আমি পিতৃহারা হইলাম। আমার কাছে ইহার অধিক অমংগলের কিছু নাই।

'নাটুর কান্না শুনিয়া আমার পিতৃপ্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি নিজেকে শক্ত রাখিয়া এক প্রকারের বৈরাগ্যের ভাব লইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিলাম। বলিলাম, উঠিয়া বস, কাঁদিয়া লাভ নাই। নাটু উঠিয়া বসিল। স্পষ্টতঃই তাহাদের উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছে। দুখা ও দুই পাইক ব্যতীত সকলের মুখেই স্বস্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ভবতারণ খুড়া বলিল, দ্বিপ্রহরের রান্নার ব্যবস্থা হউক। ফিরিয়া যাইবার কথা পরে ভাবা যাইবে। সম্ভবতঃ আজ আর ফিরিয়া যাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি, যাইতে রাত্রি হইলে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইতে পারে। আগামীকাল সকালেই যাওয়া যাইবে।'

'নাটু আর দুখা ছাড়া সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছিল, নাটুকে অনেক কথা বলি। কিন্তু কিছুই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বলিবার কিছু আছে বলিয়াও মনে হয় না। তাহাকে কাজকর্মের বিষয়, বিভিন্ন স্থানে সংগে করিয়া লইয়া গিয়া যৎপরোনাস্তি বুঝাইয়াছি। মুরশিদাবাদ নবাবের রাজস্ব বিভাগে ইস্তফা দেওয়ায়, সেখানে তাহার আর যাইবার দরকার নাই। ইস্তফা দিবার কারণ ছিল, ক্রমেই কোম্পানীর সাহেবদের সংস্পর্শ। আমাদের দুইটি পূর্ণ ও একটি অর্ধ তালুক রহিয়াছে তাহা বর্ধমান রাজার অধীন। তালুকের খাজনা বর্ধমান রাজসরকারেই জমা দিতে হয়। নবাবী আমলে, মোগল বাদশার অধীনে বর্ধমান পরগণা ছিল সরকার শরীদাবাদের অন্তর্গত। সরকার শরীদাবাদে ছাব্বিশটি পরগণা ছিল। সরকার সাতগাঁয়ের অধীনে ছিল উত্তরে পলাশী পরগণা হইতে ভাগীরথীর উভয় তীর ব্যাপিয়া। বন্দর সাতগাঁ, হুগলি জেলা ইহার অন্তর্গত ছিল। পরগণা ছিল সাকুল্যে তেতাল্লিশটি। পিতামহের সময়ে সরকার শরীদাবাদ ও সরকার সাতগাঁয়ের প্রায় ত্রিশটি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল আমার। ইহা হইতেই আমাদের বংশের উন্নতি হইয়াছিল।

'প্রপিতামহ ইহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। পিতামহ তাহা পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করিয়াছিলেন। নবাব সরকারের রাজস্ব এবং নিজের ভূমি সম্পত্তির রাজস্ব, যথাযথ আদায় ও জমা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অভিজ্ঞ-তায় দেখা গিয়াছে, অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বেশি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া খাজনা জমা দিতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকেও কারাবাস করিতে হইয়াছে।

পিতামহ খুবই সতর্ক ও নির্লোভী ব্যক্তি ছিলেন। সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনই কোন বড় পরগণা খরিদ করেন নাই। আয় বেশি হইলেই দায়িত্ব বাড়িয়া যায়। সেইজন্য তিনি আস্তে আস্তে একশ দেড়শ অথবা দুইশ মৌজা অন্তর্গত পাঁচটি তালুক কিনিয়াছিলেন। নবাবের রাজস্ব-বিভাগের কাজের সঙ্গে এই তালুকসমূহের আদায় খরচ ও সদর জমা আদৌ সহজসাধ্য কাজ ছিল না। তাঁহার তিন পত্নীর সকলেরই পুত্র অপেক্ষা কন্যা সন্তান বেশি ছিল। প্রথম পক্ষে কোন পুত্রই ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষে দুই পুত্র, তৃতীয় পক্ষে একমাত্র পুত্র আমার পিতা। পিতামহ এই তিন পুত্রকে যথাযথ শিক্ষা দিয়া নিজের সহযোগীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই মুরশিদাবাদ ও বিশেষ করিয়া কাটোয়ায় যাইতে হইত। নবাবী আমলে কাটোয়ার মাটিরগড় দৌলতখানায় খাজনার টাকা জমা দেওয়া হইত। পিতামহ কাটোয়ার গঙ্গার ধারে একটি বাড়ি করিয়াছিলেন। সৈদাবাদেও একটি ছোট বাড়ি করিয়াছিলেন। আদিবাড়ি বলিতে হুগলির বর্তমান নিজস্ব তালুক গ্রামেরই বাড়ি। ইহার বিশদ স্থান পরিচয় দিতে চাহি না। কুন্তী-নদীর তীরে সামান্য জমিজমা ও বাড়ি প্রবৃদ্ধপিতামহ নিজের সঞ্চয়ে করিয়া-ছিলেন। তিনি যশোর হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। নৈয়ায়িক পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছিল। বৃদ্ধবয়সে, মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে এই সামান্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি এখানে একটি চতুষ্পাঠী করিয়া-ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সূত্র হইতেই প্রপিতামহের মন নবাব সরকারের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পিতামহের মনে তিনিই বীজ পুঁতিয়াছিলেন। আজ আমাদের বন্দ্যোঃ বংশের যাহা কিছু সবই সেই বীজের পরিণত রূপ।

'পিতামহ বাঁচিয়া থাকিতেই আমার এক জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যু হয়। এক জ্যাঠাইমা তাঁহার সঙ্গে সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। তখন আমার বারো বছর বয়স। পিতামহ যখন তাঁহার পুত্রদের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। মৃত জ্যাঠামশাইয়ের পুত্রদের দুইটি তালুক এবং সৈদাবাদের বাড়িটি দিয়াছিলেন। অন্য এক জ্যাঠামশায় ও আমার পিতাকে তিনটি তালুক সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে আমার পিতা আর একটি তালুক কিনিয়াছিলেন। পিতামহ প্রত্যেক তালুকেই পুকুর কাটাইয়া, ঠাকুর দালান তুলিয়া, বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতএব সম্পত্তি বিভাগের সময়, জ্যাঠামশাই ও তাঁহাদের সন্তানদের সেই সব নির্দিষ্ট বাসস্থান দিয়া গিয়াছেন। দুই জ্যাঠামশাইয়ের বংশধরেরা এখন বর্ধমানের দুই ভিন্ন পরগণায় নিজেদের তালুকে সেই সব বাসস্থানে বাস করিতেছেন। আমার পিতাকে হুগলির বর্তমান বসতবাড়িটি দিয়াছিলেন। গঙ্গার ধারের বাড়ি বাগান আমাকে দিয়াছিলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবন কাটোয়ায় গঙ্গাতীরের বাড়িতে যাপন করিয়াছিলেন।

'আমার পিতার বিষয়কর্মে শেষ দিকে আর তেমন উৎসাহ ছিল না। ইংরাজ-দের প্রতাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ক্রমেই ভীত হইয়া পড়িতেছিলেন। যে কারণে তিনি আমার ও শ্যামকান্তির উপরে সমস্ত কাজের দায়িত্ব দিয়া নিজের

যৎসামান্য আয়ের জন্য বংশবাটির রাজবাড়িতে কাজ লইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আমার আড়াইটি তালুকই বর্ধমান রাজের অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। পূর্বের পরগণাগুলি অন্যভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ধমানের রাজার প্রতি দিল্লির দরবার প্রসন্ন ছিল। ইংরাজেরাও ছিল। ফলে সরকার শরীদাবাদ ও সরকার সাতগাঁ সবই বর্ধমান জিলার অন্তর্গত হইয়াছিল। ১৮৬৪ শকাব্দে (১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ) বর্ধমান জিলা জরীপ করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত উত্তরে রাজশাহী, বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর, হুগলি, পূর্বে গঙ্গা, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ পূর্ণ এবং পাছেটি। বর্ধমান নামে জিলা আসলে একটি বিশাল রাজ্যই বলিতে হইবে। ইহার ভিতর তিনটি প্রধান নগর, বর্ধমান, ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর।

'ইহাতে নিশ্চয়ই কোম্পানী হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। দুই বৎসর আগেই গোটা জিলার রাজকর ছিল সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা। ১৮৬৮ শকাব্দে (১৭৯০ খৃষ্টাব্দ) রাজা কীর্তিচন্দ্র কোম্পানীকে বত্রিশলক্ষ টাকা সম্ভবতঃ অধিক রাজকর দিয়াছিলেন। আমার পিতার ভয়ের আর একটি কারণ ছিল। তাঁহার বিশেষ পরিচিত বর্ধমান রাজবাড়ির রাজা তেজচন্দ্রের মায়ের মোক্তার, লাঙুলপাড়া নিবাসী রামকান্ত রায়ের অপমান ও লাঞ্ছনা। এই রামকান্ত রায়ের পৈতৃকবাড়ি হুগলির পশ্চিমাংশে রাধানগরে ছিল। ইনি ভুরসুট পরগণা কোম্পানীর নিকট হইতে ন' বছরের জন্য ইজারা নিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন ইহার জামিন হন। পরে, জগমোহনের নামেও মেদিনীপুরের বেতোয়া পরগণায় একটি বড় তালুক ক্রয় করা হইয়াছিল। রাজস্ব মিটাইবার মেয়াদ শেষের আগেই দেখা গেল, পিতাপুত্র উভয়েরই খাজনা বাকি পড়িয়াছে। রামকান্ত রায় হুগলির দেওয়ানি জেলে আটক হইয়াছিলেন, জগমোহন মেদিনীপুরের জেলে পাঁচ বছর বন্দী ছিলেন। জগমোহনের দ্বিতীয় সহোদর রামমোহনের সঙ্গে তখন কোম্পানীর সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল, কয়েকজন সাহেবের সঙ্গে যথেষ্ট প্রীতিও ছিল। ইঁহাদের আর এক বৈমাত্রেয় ভাই রামলোচন রাধানগরের বাড়িতেই থাকিতেন। কিন্তু রায় পরিবারের যখন ঘোর দুর্দিন, লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জরিত, তখন রামমোহন একটির পর একটি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নিজের ভাগ্যকে ফিরাইতেছিলেন। ইদানিং শোনা যায়, ইনি খৃষ্টান ও আল্লার অনুগামী, পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হইয়াছেন।

'যাহাই হউক, রামকান্ত রায়ের এই পুত্র সম্পর্কে আমিও কিছু কিছু কথা জানিতাম। রামকান্ত রায় অতিশয় সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রদের সকলকে সমান ভাবে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা, বর্ধমান রাজবাড়িতে কর্ম গ্রহণের পূর্বে। সেই সময় রামমোহন পিতার নিকট, গৃহের বিগ্রহ সেবার অঙ্গীকার করিয়াই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। অথচ পরে যখন একেশ্বরবাদী হন, তখন তিনি পিতৃসম্পত্তি ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গীয় ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, দেশের ধর্মবিশ্বাসের দুরবস্থার জন্যই তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

ফারসী ভাষায় তাঁহার একটি পুস্তক, "তুহফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন" আমি পাঠ করিয়াছি। উহা কি কেবলই আমাদের অন্ধবিশ্বাসকে দূর করিবার জন্য? বস্তুত এই ব্যক্তি অনেক আগে হইতেই মুসলমানি ধ্যান লইয়াছিলেন। সাহেবরা আসিয়া সেই ধ্যান আরও বাড়াইয়া দিল। তাঁহার পিতা যখন দেনার দায়ে জেল খাটিতে-ছিলেন, দাদা জগমোহন একই কারণে জেলে পচিয়া মরিতেছিলেন, তখন ইনি দুই তিন সাহেবকে টাকা কর্জ দিয়া, সুদে আসলে টাকা জমাইতেছিলেন। মুসলমান ও খৃষ্টানদের সঙ্গে যুগপৎ সম্পর্ক রফা করিয়া, নামে ও বেনামীতে প্রচুর সম্পত্তি করিতেছিলেন। পিতা বা অগ্রজকে কোনরকম সাহায্য করেন নাই। জগমোহন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামমোহনের নিকট সকাতর ভাবে অর্থ প্রার্থনা করেন। তখন তিনি অগ্রজকে এই শর্তে এক হাজার টাকা ঋণ দিয়াছিলেন যে, এক বছরের মধ্যে সুদ সমেত টাকা ফিরাইয়া দিবার তমসুক লিখিয়া দিতে হইবে। অগ্রজ তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রূপেই বিষয়ী ব্যক্তিগণ নিজের অর্থ প্রতিপত্তি বাড়াইয়া থাকে। রামমোহনও তাহাই করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ইংরাজদের বহু ইষ্ট করিয়াছিলেন। ভূটানে যাইয়া রাজাদের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, ইংরাজদের কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন। নেপালের যুদ্ধের সময়, ভূটানের রাজার সঙ্গে ইংরাজদের বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নবাবশাহী অস্তমিতপ্রায়, ইংরাজেরা প্রবল প্রতাপে অগ্রসর হইতেছে। এই উভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া এই ব্যক্তি যে-ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাকে কি করিয়া শুদ্ধ অন্তরে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণে বিশ্বাস করিব। শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার মা ও ভ্রাতাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। এই সব ঘটনায় আমার পিতা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব সরকারের চাকরি ত্যাগ করিয়া বাঁশবেরিয়ার রাজার কাজ লইয়াছিলেন। সম্পত্তি বাড়াইবার লোভ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

'আমার মনে উভয়সংকট উপস্থিত হইয়াছিল। নবাবশাহীর পরিণাম, পূতি-গন্ধময় পরিবেশ সহিতেছিল না। ঘুষখোর অত্যাচারী সাহেবদের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। রামকান্ত বন্দ্যোর পুত্র রামমোহনের ন্যায় আনুগত্যবোধও আমার ছিল না। এক্ষণে পৌত্তলিকতা বা একেশ্বর, আমার কাছে সবই মিথ্যা। সমস্ত জগৎ সংসার আমার সামনে নতুন এক রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপের গর্ভে কী বিরাজ করিতেছে, আমি জানি না। শুধু ইহাই অনুভব করিতেছি, তেত্রিশ কোটি দেবতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমার মধ্যে আর নাই। নানা জিজ্ঞাসা ও অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছি।

'যাই হোক, রামকান্ত রায়ই আমার পিতার মনে এরকম ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পিতামহ বহু পূর্ব হইতেই আমাকে ও শ্যামকান্তিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বারে বারেই বলিতেন, অতি লোভ ভাল নহে। সম্পত্তি বাড়াইতে অসুবিধা নাই, উহা বজায় রাখা কঠিন। বিশেষতঃ বর্তমানের

ইংরাজ কোম্পানীর রাহুর গ্রাস সম্পর্কে তিনি আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে বলিতেন।

'পিতামহের কতগুলি কথা আমি কখনই ভুলিব না। তিনি বলিতেন, আমরা এদেশীরা দীর্ঘকাল পরাধীন হইয়া আছি। অপরের দোষ নহে, ইহা আমাদেরই চরিত্রহীনতা ও কাপুরুষতার ফল। তথাপি মুসলমান রাজারা যখন এদেশ দখল করিয়াছিল, তখন পিছনে তাহারা নিজেদের স্বদেশ বলিয়া কিছু রাখিয়া আসে নাই। ইহারা রাজশক্তির দ্বারা আমাদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু এ দেশকেই নিজেদের স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। সিংহাসনের লোভে ইহারা পিতৃহন্তা ভ্রাতৃঘাতী হইতেও দ্বিধা করে না। ইহা সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই আছে। আমাদের স্বাধীন হিন্দু যুগেও ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এ দেশকেই স্বদেশ জানিয়া, নিজেদের মঙ্গল বিধানে আমাদেরও কিছু মঙ্গল করিয়াছে। এমন কি ধর্মের দিক হইতে রাজপুরুষেরাও হিন্দুয়ানি একেবারে বিসর্জন দিতে পারে নাই।

'কিন্তু ইংরাজেরা এখানে আসিয়াছে কেবল লুঠ করিতে। এদেশ তাহাদের কাছে বিদেশ, তাহাদের লক্ষ্য নিজেদের স্বদেশের উন্নয়ন। পলাশীর যুদ্ধের পরে তাহারা রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। লুটতরাজ, দরিদ্র রায়তদের প্রহার, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়াইয়াছে। তাহারা বিনা মাশুলে সকল দ্রব্য ক্রয় করে, বিক্রয় করিতে হইলে অধিক মাশুল গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ প্রতিবাদ করিলে নবাবের বাবারও ক্ষমতা নাই, তাহাকে রক্ষা করে। নবাব তাহাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। মীরকাসিমের দুরবস্থা ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। দিল্লির সনদে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি পাইয়া তাহাদের লোভ ও নিষ্ঠুরতা চরমে উঠিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপারে তাহাদের যাহারা সাহায্য করিয়াছে, তাহারা নিজেদের সচ্চরিত্র, ভদ্র, গুণী বলিয়া দাবী করে। আমি বুঝি না, সিরাজদ্দৌলা অপেক্ষা নবকৃষ্ণ, জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তিরা কী গুণের গুণনিধি। নবাবের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে তাহারা ইংরাজকে শাসন-ক্ষমতা দিয়াছে। নবাবের অপেক্ষা ইংরাজরা কোন দিক হইতে ভাল? নবাবদের তবু একটা আভিজাত্যবোধ ছিল। কোম্পানীর সাহেবদের তাহাও নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহারা এক শ্রেণীর দেশত্যাগী হৃদয়হীন ভাগ্যান্বেষী নীতি-জ্ঞানহীন অর্থলিপ্সু। মানিতে হইবে, উহাদের বুদ্ধি অতি কুটিল, বেপরোয়া। যোদ্ধা হিসাবে উহারা এমন কিছু দুর্ধর্ষ নহে। নবাবের সকলরকম দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, নবাব-বিরোধীদের সাহায্যে যুদ্ধে জিতিয়াছে। অবশ্য উহাদের বানিয়া দূরদৃষ্টিও আছে। শুনিয়াছি উহাদের দেশে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে আমাদের কী লাভ? দেশের যে-সব ব্যক্তি কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে, তাহারা কে-ই বা সৎ? উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সাহেবদের চাটুকারিতা করিয়া কিছু প্রসাদ পাইয়াছে। ইহাদের আভিজাত্যবোধই বা কিসে আছে। এই সব ইংরাজ-প্রভুভক্ত, নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া,

নিজেদের উদর পূর্তি করিতেছে। দেশের ব্যবসায়ী বণিকরা দরিদ্র রায়তরা সশংকিত জীবন যাপন করিতেছে।

'আমাদের দুর্ভাগ্য, দিল্লি ও বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিজেদের উচ্ছৃঙখলতায় ও বিবাদে মগ্ন থাকিয়া, বিশ্বাসী অনুচরদের ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকায় ইংরাজদের কাছে পর্যুদস্ত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, লাগিয়া থাকিবেও। কারণ দেশের সমস্ত সম্পদ ইংরাজরা তাহাদের স্বদেশে লইয়া যাইতেছে। তাহাদের রাজারাণী আছে, শুনিয়াছি শাসন পরিচালনার জন্য সেখানে জনপ্রতিনিধিরা আছে। উহা তাহাদের বিষয়। তাহাদের স্বদেশের বিষয়। কিন্তু এ দেশকে অবাধে লুণ্ঠন করিয়া নিজের দেশের পুষ্টিসাধন করিতেছে। ইহারা অত্যন্ত চতুর, চরিত্রে নিষ্ঠুর, নীচাশয়। লোভের জন্য যে কোন অপকর্ম করিতে ইহাদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। ইহারা কোন সুকর্ম করিলেও জানিবে, পিছনে নিশ্চয়ই নিজেদের স্বদেশের কোন সুসারের গূঢ় কারণ রহিয়াছে।

'এ সমস্ত কথাই আমি নাটুকে বলিয়াছি। সতর্ক করিয়াছি, কিন্তু কালগতি ভিন্ন। নাটু কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে। সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, আমার আর বলিবার কিছু নাই। তালুক-মুলুক সংসার-সমাজ স্ত্রী-পুত্র সকলই আমার পিছনে পড়িয়া রহিল। এই পৃথিবীতে আমি এখন এক নতুন আগন্তুক। অতীত থাকিয়াও নাই। ভবিষ্যৎ অজানা। মনে হইতেছে কোন অলক্ষ্য হইতে এই পৃথিবীতে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।'



'প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলে মানুষের জন্মই একপ্রকার এইরূপ। আমি দৈবক্রমে আজ ইহা উপলব্ধি করিতেছি। জীবধর্মে আমার জন্ম হইয়াছে, কিন্তু আমার জীবনের নিয়ামক আমি নহি। জন্মসূত্রেই মানুষ এই পৃথিবীতে আগন্তুক মাত্র। তাহার ইচ্ছায় কিছুই ঘটে না। যে সংসারে ও পরিবেশে সে জন্মায়, তাহার স্রোতে সে ভাসিয়া চলে। এই ভাসিয়া চলার গতিপথ, তাহাকে নানাদিকে প্রবাহিত করিতেছে। সে ইহাকে নিজের কর্মফল জানিয়া, জীবনকে সেই স্বরূপে দেখিতেছে। কিন্তু তাহা আদৌ তাহার কর্মফল নহে। তাহার নিয়তি তাহাকে চালিত করিতেছে।

'সারাটা দিন ও রাত্রির মধ্যে অনেকবারই ইচ্ছা হইল, নাটুকে লক্ষ্মণার ও তাহার সন্তান দুইটির বিষয়ে কিছু বলি। নিজের সহোদরদের বিষয়ে সে উদাসীন থাকিবে না, বা তাহাদের বঞ্চিত করিবে না। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাইদের বঞ্চিত করা কিছু আশ্চর্যের নহে। লক্ষ্মণার বয়স এখন তেইশ। তাহার প্রথম পুত্রটির বয়স এখন এগার। দ্বিতীয় পুত্রটির সাত।

'কিন্তু কিছু বলা নিরর্থক। নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝিতেছি, নিয়তির দ্বারা তাহাদের জীবন চালিত হইবে। মানুষ মাত্রের জীবনই একরূপ। নাটুর জীবনও তাহার নিয়তির দ্বারা চালিত হইতেছে। এই উপলব্ধির পরে আর আমার অতীতের ভূমিকা লইয়া তাহাকেও কিছু বলিবার নাই। তথাপি সারারাত্রি নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। গত রাত্রের মতই বারে বারে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নের মধ্যে ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণাকে বেশি দেখিলাম। তাহাদের প্রতি আমার আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। সত্য বলিতে কি, মনের গূঢ় আকাঙ্ক্ষা অতি বিচিত্র। বিষয়কর্ম বা সন্তানসন্ততিদের স্বপ্ন বিশেষ দেখিলাম না। কখনও ইন্দুমতীকে, কখনও লক্ষ্মণাকে স্বপ্নের মধ্যে কামোল্লাসে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিতেছিলাম। বিবিধ শৃঙ্গারে ও রমণে লীলা করিতেছিলাম। কখনও দেখিতেছিলাম, ইন্দুমতীর কামনা-উদ্বেল বাহুপাশে আলিঙ্গিত হইয়া তাহার টাড়বালা (ব্রেস-লেট) আমার কাঁধে ঈষৎ ক্ষতের রেখা আঁকিয়া দিয়াছে। লক্ষ্মণাকে তাহার কটি-দেশের রূপার শিকলি টানিয়া আকর্ষণ করিতে গিয়া শিকলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি এবং সান্ত্বনা দিতেছি, স্বর্ণকারের কাছে গিয়া শীঘ্রই উহা জোড়া লাগাইয়া আনিব। কখনও দেখিতেছিলাম, প্রভাতে শয্যাত্যাগের আগেই লক্ষ্মণা বা ইন্দুমতী আমার মুখ বুক ও বাহু হইতে তাহাদের অঙ্গের সিন্দুর ও কাজলের দাগ মুছাইয়া দিতেছে।

'এমন নহে যে, আমি অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়াসক্ত বা স্ত্রৈণ ছিলাম। কামাসক্ত ব্যভিচারীও ছিলাম না। ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণা মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান গমনকালে ঠাট্টা করিয়া বারাঙ্গনাদের কুহকে জড়াইয়া না পড়িবার জন্য সতর্ক করিয়া দিত। তাহাদের চোখে আমি সুপুরুষ ছিলাম। নগরের নাগরীরা যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। পাছে আমাকে তাহারা বশ করে, সেইজন্য শিশুতুল্য জ্ঞান করিয়া আমার বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে দাঁতে দংশন করিয়া, বুকে মুখামৃত (থুথু) ছিটাইয়া দিত। কিন্তু উভয়ে ভালই জানিত, রমণী বলিতে তাহারা দুইজন আমার একমাত্র কামনার ধন ছিল।

'রাত্রের অগভীর নিদ্রায় বারে বারে তাহাদের স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, নিয়তিচালিত উপলব্ধির মধ্যেও ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণা আমার প্রাণের গভীরে আন্দোলিত হইতেছে। ইহা আমার কাছে বিস্ময়কর বোধ হইল। দৈনন্দিন জীবনে তাহাদের সংসারের কাজ, গৃহদেবতার পূজার আয়োজনে রত, সন্ধ্যায় গা ধুইয়া নতুন সজ্জায় সজ্জিত, ধূপদীপ মাঙ্গলিক লইয়া ব্যস্ত, স্বপ্নের মধ্যে তাহাও দেখিতেছিলাম। অধিকাংশ স্বপ্ন তাহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া আমার নিদ্রার ঘোরে আবর্তিত হইতেছিল। অথচ পূর্বে এইরূপ কখনও হয় নাই। আমার জীবন তো কেবল তাহাদের লইয়া অতিবাহিত হইত না। বরং কর্মোপলক্ষে বছরের অনেগুলি দিন বাহিরে কাটাইতে হইত। জমিদারদের ন্যায় গৃহে বসিয়া কেবল কর্মচারিদের দ্বারা কাজ মিটিত না। গৃহে থাকিলেও সদা সর্বদাই বিষয় কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত। অথচ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে যখন এতকালের জীবন

অতীত হইতে চলিয়াছে, তখন স্বপ্নের মধ্যে তাহারাই বারে বারে আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। জীবনের এই রহস্য বুঝিতে পারিলাম না।'



'রাত্রি প্রভাত হইল। ত্রিবেণী সারারাত্রিই জাগিয়া থাকে। সারা ভারত হইতে বার মাস এখানে তীর্থযাত্রীদের ভিড়। বিশেষ করিয়া উড়িষ্যাবাসীদের ভিড় সর্বাপেক্ষা বেশি। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরাও এই পুণ্যভূমি মুক্তবেণীতে স্নানের জন্য বারমাস যাওয়া-আসা করে। স্নানযোগ থাকিলে তো কথাই নাই। অর্ধোদয় যোগে এখানে যে বিশাল ভিড় হয়, তাহা গঙ্গার ধার ধরিয়া ক্রোশ পর্যন্ত তীর্থ-যাত্রীতে ভরিয়া যায়। কার্তিক মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান একটি আবশ্যিক পালনীয় ধর্ম। সেইজন্যই এখন বহুলোকের ভিড়। ব্যবসা বাণিজ্যের আগের অবস্থা না থাকিলেও এখনও মুর্শিদাবাদ বর্ধমান হইতে আগত মালবাহী নৌকা ও জাহাজ এখানে নোঙর করে। তাহা ছাড়া, গঙ্গাযাত্রী আমি একলা নহি। প্রতিদিনই গঙ্গা-যাত্রী আসিতেছে। বাঁধান ঘাটে জায়গা না পাইলে, আশেপাশে অনেক চালাঘর প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাযাত্রীদের রাখা হয়। ইহারই মধ্যে অন্তর্জলীর জন্যও দুই এক নারী পুরুষকে সর্বদাই দেখা যায়।

'আমি অপরিচিত, স্থানীয়, বিদেশী বহিরাগতদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। আমাকে লইয়া তাহাদের আলোচনার শেষ নাই। অধিকাংশের চোখে আমি কৃপার পাত্র। কাহারও মতে পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করিতেছি। এ সকলই আমার নিকট উৎপাত বোধ হইতেছে। অন্তরে ক্রোধ ও উত্তেজনার উদ্রেক হইতেছে। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলে সকলে আমাকে উন্মাদ ভাবিবে। মনে করিবে সংসার সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে।

'সর্বাপেক্ষা উৎপাতের বিষয় হইল, কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া। যাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহারা আমার প্রতি করুণাবশতঃ নানাপ্রকার আক্ষেপ করিতেছে। আমার বংশ ধন সম্পত্তি লইয়া আলোচনা করিতেছে। আহা, ইহার কী বা বয়স। স্বাস্থ্য অতি উত্তম দেখাইতেছে। মৃত্যুর কোন লক্ষণই নাই। কুলীন-কুলমণি, লক্ষ্মীর বরপুত্র, গৃহে না-জানি কত পত্নীরা রহিয়াছে।

'আমি ইহাদের মনে মনে গালি দিতেছিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, ইহাদের মুণ্ডচ্ছেদ করি, লাথি মারিয়া দূর করি।

'এই তীর্থে সকলেরই আগমন হইয়া থাকে। বৈদ্যরা ওষুধের ঝুলি লইয়া ঘুরিতেছে। ব্রাহ্মণরা স্নান তর্পণের মন্ত্র পড়াইবার জন্য ও পারলৌকিক কাজের আশায় ঘুরিতেছে। তাম্বুলী মালাকারেরা ফুল ও মালা লইয়া ফিরিতেছে। নাপিতরা তাহাদের পেটিকা লইয়া সকলের কাছে যাইতেছে। এমনকি দু এক

বৈদ্য আমাকে এখনও চিকিৎসা করিয়া ওষুধ দিতে চাহিতেছে। বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা হইলেও চুপ করিয়া রহিলাম। উহাতে বিবাদের সৃষ্টি হইবে। ইহারা সকলেই আপন আপন জীবিকার কারণে এই মহাশ্মশান ও তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই বাঁচিতে চাহে। ইহারা বাঁচিবার জন্যই এই জনারণ্যে হাঁকিয়া ফিরিতেছে। ভিড় ও কোলাহলের অন্ত নাই।

'ইহারই মধ্যে আমি সরস্বতীর জঙ্গল ঘুরিয়া আসিয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া স্নান করিলাম। আজ আমার কাহারও সাহায্যের দরকার হইল না। শরীরে দুর্বলতা বোধ প্রায় নাই! স্বাভাবিক সুস্থ বোধ করিতেছি। আমার সঙ্গে সকলেই স্নান করিল। সকলেরই বিশেষ তাড়া। শ্যামকান্তি ভবতারণ খুড়া ও নাটু স্নানের পরে গায়ত্রী জপ করিল। আমি করিলাম না। গতকালও করি নাই। আজ ভবতারণ খুড়া জিজ্ঞাসা করিল, তর্পণ গায়ত্রী কিছুই করিলে না। উত্তর দিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ভবতারণ খুড়াও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

'নাটু কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার মধ্যে শ্যামকান্তি ও পরমেশ ভট্টাচার্য প্রাতঃকালীন খাদ্যসমূহ লইয়া আসিল। ইহাদের সঙ্গে আজ আমার শেষ আহার। খাওয়া শেষ হইলে, শ্যামকান্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কলিকাতায় যাইবেন?

'আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, না, আর যেখানেই যাই, কলিকাতায় যাইব না। পরমেশ ভট্টাচার্য বলিল, যেখানেই যান, আপনার অর্থের প্রয়োজন। তাহার কী ব্যবস্থা করা যাইবে। আপনি এখানে কয়েক দিন থাকিলে টাকা আনিবার ব্যবস্থা করা যায়।

'ভাবিলাম, টাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এককালীন বেশি টাকা লইয়া আমি কোথায় কী করিব। টাকা যখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখনই বা কি করিব। আমি যখন পরিত্যক্ত হইয়াছি, তখন টাকাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমি জানি, পরমেশ ভট্টাচার্য কেন টাকার কথা বলিতেছে। আমার ন্যায় গঙ্গাযাত্রী ব্যক্তিরা বাঁচিয়া উঠিয়া কোথাও গিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিয়া থাকে। আমার সেই রূপ কোন ইচ্ছা নাই। বলিলাম, আমার বেশি টাকার দরকার নাই। তোমাদের কাছে গঙ্গাযাত্রা, দাহ ও শ্মশানকার্যের জন্য যদি কিছু টাকা থাকে, তাহা আমাকে দাও। তাহাতেই আমার চলিবে।

'ইহা যথার্থ অভিমানের কথা নহে। ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার অন্তর মথিত হইতেছিল। নতুন করিয়া অর্থবিত্তসহ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের কোন আকাঙ্ক্ষা আমার আর নাই। নাটু উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন।

'বলিলাম, যেরূপে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিলাম, সেরূপেই জীবনধারণ করিব। তোমাদের কাছে অর্থবস্ত্র কিছু থাকিলে তাহাই আমাকে দিয়া যাও। যেখানে আমার আর প্রত্যাগমনের অধিকার নাই, সেখানকার কিছুই আর আমি দাবী করিব না। সেইজন্যই কেবল মাত্র গঙ্গাযাত্রা ও শ্মশানকার্যের জন্য যাহা কিছু

আনিয়াছ, আমাকে তাহাই দাও।

'নাটু সকলের দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জিজ্ঞাসু চোখে তাকাইল। কেহই কিছু বলিতে পারিতেছে না। একমাত্র পরমেশ ভট্টাচার্য অবশেষে বলিল, মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহাই করা উচিত।

'তখন নাটু ও শ্যামকান্তি ধুতির কোমরে গোঁজা থলি বাহির করিয়া সমুদয় অর্থ আমাকে দিল। উভয়ের কাছে সর্বসমেত কিছু খরচাসহ পঞ্চাশটি ফড়াক্কা-বাদী সনাতি টাকা ছিল। সনাতি অর্থাৎ সনওয়াতি, পোদ্দারের নিকট ভাঙাইতে গেলে সন মোতাবেক কিছু কম মূল্যে ভাঙাইয়া দেয়। এক সনের মুদ্রিত টাকার দাম পরের সনে কিছু কমিয়া যায়। ইহা পোদ্দারের কারসাজি মাত্র, অন্যথায় ভাঙান যায় না। কেহ কেহ এই টাকাকে ফড়াককাবাদী টাকাও বলে। কারণ ফড়ককাবাদের নতুন টাকশালে ইংরাজ কোম্পানী এই টাকা প্রস্তুত করে। নাটু ও শ্যামকান্তির টাকার থলিতে সিন্দুর মাখান ছিল। টাকা ছাড়া, থলির মধ্যে সিন্দুর লাগান কড়ি, সুপারি, কয়েকটি ধান ও দুর্বা ছিল। আমি টাকা ও ভাঙান খুচরা মুদ্রাগুলি লইয়া তাহাদের থলি ফিরাইয়া দিলাম।

'নাটু তাহর থলিটি আমাকে রাখিতে বলিল। আমি মনে মনে হাসিলেও বলিলাম, উহা তোমার সৌভাগ্যের থলি, তোমার কাছেই রাখ। গতকালের ধোয়া শুকনো বস্ত্রটি আমি পরিয়াছিলাম। ইহা একটি পুরনো চন্দ্রকোণা ধুতি। সম্ভবত গঙ্গাযাত্রার প্রাক্কালে ইন্দুমতী বা লক্ষ্মণা হাতের সামনে ধুতিটি পাইয়া আমার কোমরে জড়াইয়া দিয়াছিল। গতকালের খুইয়াঁ বস্ত্রটি দুই পাইক হাতে ধরিয়া শুকাইবার চেষ্টা পাইতেছে। নাটু আমাকে আরও দুই খণ্ড বস্ত্র দিল। ইহা প্রায় শাটির তুল্য। মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন। বুঝিতে অসুবিধা হইল না, আমার মুখাগ্নি ও দাহকর্মের পরে স্নান করিয়া সে এই বস্ত্র কাছা লইবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহার আর প্রয়োজন হইল না, অতএব ইহা আমার বরাতেই জুটিল। অতিরিক্ত একটি নতুন গামছাও সে আমাকে দিল। সেই সঙ্গে গতকালের ধোযা শুকনো নিমাস্তানটিও (হাফ হাতা পাঞ্জাবী বিশেষ) দিল। আমি সেইটি গায়ে পরিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের নৌকা কোথায় রাখিয়াছ?

'নাটু বলিল, উত্তরে জামাই জাঙ্গালের বাঁকে। দুয়া ঘরের বাহিরে সিঁড়ির ওপর গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নাটু ধরিতে আসিল, প্রয়োজন হইল না। বলিলাম, পাইকদের বল, আর কাপড় শুকাইবার সময় নাই। আমি সবই এই গামছায় বাঁধিয়া লইতেছি।

'নাটুকে বলিতে হইল না। পাইকরা আসিয়া বলিল, কাপড়টি অর্ধেক শুকাইয়াছে। তাহারাই গামছার এক অংশে অর্ধেক ভিজা কাপড়টি, বাকি অংশে নাটুর কাছা লইবার বস্ত্র দুই খণ্ড বাঁধিয়া দিল। টাকাগুলি আমি আগেই কোমরের কষিতে গুঁজিয়াছিলাম। আমাকে যে খট্টা ও বিছানায় লইয়া আসা হইয়াছিল, রাত্রি পোহাইবার আগেই তাহা শ্মশানের ডোম আসিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি বাঁচিয়া উঠিবার পর হইতেই আমার শ্মশানযাত্রা শয্যার প্রতি সে লক্ষ্য রাখিয়া-

ছিল। বলিয়াছিল, মন্দার কড়ি যখন পাইলাম না, তখন ইহাই যথেষ্ট অর্থাৎ প্রতি মৃতদেহ পিছু তাহার কিছু প্রাপ্তি থাকে। আমি বাঁচিয়া উঠিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছি।

'আমি বলিলাম, এখন ভরা কোটাল জোয়ার রহিয়াছে, তোমরা আর বিলম্ব করিও না। যাত্রা কর। আমি নিজই দুষাকে ডাকিলাম। দুযা কাঁদিতেছিল। কাছে আসিয়া বলিল, বড় কর্তাদাদা, আমি আর ফিরিয়া যাইতে চাহি না। আপনার এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী। আমাকে দেখাইয়া গ্রামের সকলে বলিবে, আমিই কুস্তিযুদ্ধে আপনার সর্বনাশ ঘটাইয়াছি। আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন।

'আমি তাহাকে বলিলাম, আমার সঙ্গে কেহ যাইবে না। মরিলেও যাইত না। তোকে ফিরিতে হইবে। তোকে কেহ দোষ দিবে না, বলিবে ইহা বেদো বন্দোর ভাগ্য। আমার কথার অবাধ্যতা করিস না, চলিয়া যা।

'সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বর কঠোর শুনাইল। দুযা আর আপত্তি করিল না। আমার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া সকলের আগে চলিয়া গেল। ভবতারণ খুড়া আর পরমেশ ভট্টাচার্য ছাড়া সকলেই আমাকে প্রণাম করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, ভবতারণ খুড়া আমার দুর্বল শরীরের কথা বলিয়া আপত্তি করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, খুড়া, এখন তোমাকে টানিয়া লইয়া গঙ্গায় ডুবাইতে পারি। আমাতে এখন প্রেত ভর করিয়া আছে। বাক্যব্যয় না করিযা তাড়াতাড়ি চল।

'ভবতারণ খুড়ার মুখে ভীতির অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল। সে আর কথা না বলিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। চারিপাশে প্রচন্ড ভিড়। খড় ও শনের অতি নীচু ছোট ছোট দোচালা খুপরির ছড়াছড়ি। স্নানযাত্রীরা এই সব ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। উঁচু পাড়ে, সারবন্দী গরুর গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাল বোঝাই ও খালাস যুগপৎ চলিতেছে। পশ্চিমের আরও উচ্চে হাটখোলা, বহুতর দোকানপাট। আমি সকলের সঙ্গে জামাই জাঙ্গালের বাঁধের রাস্তা দিয়া উত্তরে চলিলাম। বেশি দূরে যাইতে হইল না। এক পোয়া ক্রোশেরও কম, জাঙ্গালের নীচে জঙ্গল ও গাছপালা ভাসাইয়া ভরা কোটালের জল তীব্র বেগে বহিতেছে। দুইটি নৌকা দুই গাছে দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল। একটিতে হোগলার ছই। উহা আমাদের ব্যবহারের জন্য। আর একটি জেলে ডিঙ্গি। ইহাও আমাদের। কুন্তী নদীতে মাছ ধরিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। আমি নিজেও অনেকবার এই জেলে ডিঙিতে করিয়া কুন্তী নদীতে মাছ ধরিয়াছি। ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গায় আসিযাছি।

'মাঝিরা সকলেই আমার পরিচিত। তাহারা আমার দিকে ভয়বিস্মিত চোখে যেন অলৌকিক কিছু দর্শন করিতেছে। ভবতারণ খুড়া মাঝিদের নৌকা তীরে লাগাইতে বলিল। মাঝিরা নৌকার দড়ি খুলিয়া লগি ঠেলিয়া, নৌকা দুইটিই তীরে লাগাইল। আবার সকলে আমার দিকে চাহিল। আমি নাটুর হাত ধরিয়া তাহাকে বাঁধের ঢালুতে নামাইয়া দিলাম। শ্যামকান্তি কিছু বলিতে চাহিল, পারিল না। কান্নায় স্বর বন্ধ হইল। দুযা সকলের আগে জেলে ডিঙ্গিতে লাফাইয়া পড়িল। একে একে সকলেই নৌকায় উঠিল। অনেকগুলি বড় বড় গাছ থাকায়

মাঝিদের সুবিধা ছিল। তাহারা গাছ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সকলে উঠিবার পরে মাঝিরা গাছ ছাড়িয়া, লগি ঠেলিয়া দিল। নৌকা জলে ডুবিয়া যাওয়া জঙ্গল হইতে গঙ্গার স্রোতে গিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে নৌকা দ্রুত উত্তরে ভাসিয়া চলিল।

'মনে হইল, আমার হৃৎপিণ্ড বুক ঠেলিয়া গলার কাছে আসিতেছে। চোখ ঝাপসা হইয়া যাইতেছে। অলক্ষ্য হইতে নিক্ষিপ্ত সংসারে নব আগন্তুকের উপলব্ধিকে অতীত এই মুহূর্তে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া দিতে চাহিল। আমার চোখের সামনে গ্রাম গৃহ সংসার ঘর, মা, ইন্দুমতী লক্ষ্মণা পুত্র-পৌত্র দাসদাসী সকলের মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল। কাল বসিয়া থাকিবে না, সংসার নিশ্চল থাকিবে না, জীবন স্তব্ধ হইবে না। সকলই তাহার আপন নিয়মে চলিবে। তথাপি একটা তীব্র শোকের অনুভূতি আমাকে গ্রাস করিতে চাহিল। আমি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের এই অহেতুক আবেগকে দমন করিতে চেষ্টা করিলাম।'



'জামাই জাঙ্গালের তীরে ঘন বৃক্ষের অন্তরালে, দুইটি নৌকাই অদৃশ্য হইল। গামছার পুঁটলি দিয়া আমি চোখ মুছিলাম। কিন্তু গঙ্গার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে হইতে, পূর্ব মুহূর্তের সকল চিত্র মুছিয়া যাইতে লাগিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রমে আমি আপনাকে খুঁজিয়া পাইতে লাগিলাম। সকলে সকলের সহিত সম্পর্ক খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু সকলেই একাকী এবং সকলেই তাহার নিয়তির দ্বারা চালিত হইতেছে। কেহ কাহারও জীবনের নিয়ামক নহে। এই উপলব্ধির মধ্যে, বেদান্তের সংসারের অনিত্যতা ভাবনা আমাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। কেহ কাহারও নহে। এই যদি সত্য, তবে জন্মাইলাম কেন। যদি জন্মাইলাম, তবে নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হইলাম কেন। ভাবিয়া অন্তরে সেই ক্রোধ ও ঘৃণা জাগিয়া উঠিয়া, একপ্রকারের বিবমিষা সৃষ্টি করিল। বমনোদ্রেক হইল অথচ বমন হইল না। কেবল বারে বারে থুৎকার দিলাম, এবং ধীরে ধীরে একটা বিরক্ত বৈরাগ্যের ভাব আসিয়া আমাকে এই বিশ্বসংসারের প্রতি সমস্ত কৌতূহল নিবারণ করিয়া, একটা অনীহা সৃষ্টি করিল।

'এই জামাই জাঙ্গাল (সড়ক বা রাস্তা) ত্রিবেণী হইতে মহানাদ পর্যন্ত গিয়াছে। শুনিয়াছি, গঙ্গার বাঁধ তৈরির জন্য, এই সুদীর্ঘ জাঙ্গালটি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব তৈরি করাইয়াছিলেন। ঘাট গঙ্গাযাত্রার ঘরও তাঁহারই তৈরি। সেইজন্য উড়িষ্যাবাসীদের কাছে ত্রিবেণী অধিক খ্যাতনামা তীর্থ। এখানে পুণ্য করিতে আসিয়া তাহারা নিজেদের রাজার গৌরবও অনুভব করে। দেখিতেছি, এই কার্তিকের স্নানযাত্রা উপলক্ষে তাহাদের ভিড় এদিকেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গোলপাতা শন ও খড়ের নীচু দোচালা খুপরি করিয়া প্রভাতের স্নান শেষে,

রান্নার আয়োজন চলিতেছে।

'সহসা মহানাদের জীয়তকুন্ডের কথা আমার মনে পড়িল। উহা নাকি দেবখাত নামে খ্যাত। উহার জল সিঞ্চনে মৃতও প্রাণ ফিরিয়া পাইত। মুসলমানরা আসিয়া, কুন্ড স্পর্শ করিয়া দেবখাতের জীবনদায়িনী শক্তিকে নাকি নষ্ট করিয়াছে। মানুষ এইরূপ ভাবিতে ভালবাসে, বিশ্বাস করিতে চাহে. আর প্রবাদকে প্রচার করিয়া থাকে। একবার ভাবিলাম, এই পথে হাঁটিতে আরম্ভ করি। পরে মনে হইল, এই পথে কুন্তী নদী অতিক্রম করিতে হইবে। এই পথে যাইব না। ত্রিবেণীর ঘাটের দিকেই ফিরিয়া গেলাম। যাইতে যাইতে নিমাস্তিনের খোলা বুকে হাত পড়িতে পৈতার স্পর্শ পাইলাম। উহা তৎক্ষণাৎ টানিয়া ছিঁড়িয়া পাশের জঙ্গলে নিক্ষেপ করিলাম। এখন আমার আর কোন জাত নাই, গঙ্গাযাত্রা করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছি। লোকে প্রেত বিবেচনা করিবে। আমি মূর্তিমান অমঙ্গল। কিন্তু পৃথিবীতে নতুন আগন্তুক আমি একজন মানুষ মাত্র। আর কোন পরিচয় নাই। অতীতের কোন সংস্কার বিশ্বাসও নাই।'



'তিন রাত্রি ত্রিবেণীতে আমিও স্নানযাত্রীদের সঙ্গে বাস করিলাম। ইতিমধ্যে একজন নরসুন্দরকে ডাকিতেই সে আগ্রহ সহকারে তাহার কাঠের ছোট পেটিকা খুলিয়া বসিল। আমি তাহার কাছে সীসক (আয়না) চাহিলাম। সে আমাকে একটি কাঁসার উজ্জ্বল মসৃণ দর্পণ দিল। আমি আমার মুখ দেখিলাম। কয়েকদিনের দাড়ি গজাইয়াছে। এমন কিছু বেশি দিনের নহে। সচরাচর তিন দিন অন্তর নরসুন্দর ক্ষৌর কাজ করিত। আমার দুই চারিটি কেশ পাকিলেও, গোঁফ দাড়ি কিছু বেশি পাকিয়াছিল। তাহার দর্পণটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার পুরনো সীসক নাই, বিলাতি আয়নাও নাই? আজকাল তো সকলে তাহাই ব্যবহার করে। জবাবে নরসুন্দর জানাইল, কোন এক প্রতিবেশী শ্যালককে বিলাতি আয়না আনিবার জন্য টাকা দিয়াছিল। সে শ্যালক (ব্যাঙ্গার্থে) সেই যে কলিকাতায় গিয়াছে আর ফিরিয়া আসে নাই। বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া কাঁচি কাকই ক্ষুর ইত্যাদি বাহির করিল। আমি তাহাকে একটি পয়সা দিয়া বলিলাম, আমার চুল দাড়ি কাটিবার প্রয়োজন নাই।

'নরসুন্দর হতাশ হইল। বিরক্ত হইয়া আমার হাত হইতে দর্পণটি লইয়া পেটিকায় ভরিয়া বিড়বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমার মাথার চুলগুলি জট পাকাইয়াছে। কয়েকদিন আঁচড়ান হয় নাই। দুর্বল বোধ না করিলেও মুখে একটা ক্লিন্নতার ছাপ পড়িয়াছে। চোখ দুইটি ঈষৎ লাল, কোলগুলি বসিয়া গিয়াছে। তিন দিনই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের গৃহের কাছাকাছি একবার করিয়া

ঘুরিয়া আসিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পরে টোলের আর সেই চেহারা নাই। সরস্বতীর সাঁকোর কাছে গিয়া ওপারের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছি। অদূরেই বংশবাটি. লক্ষ্মণার পিত্রালয়। এই পথে অনেকবারই গিয়াছি। লক্ষ্মণার সেই প্রথম দর্শনে হতচকিত বিমূঢ় পলায়নের চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। তেরো বছরের কিশোরীটি এখন তেইশ বছরের যৌবনের ভারে মন্থরগামিনী আর এক সৌন্দর্য পাইয়াছে।

'তিন দিনই. পূর্ববঙ্গের ও উড়িষ্যাবাসীদের কাছে মূল্য দিয়া খাইতে চাহিয়াছিলাম। কেহ নিতান্ত ভিক্ষুক ভাবে নাই। তবে মূল্য না লইয়া খাইতে দিয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা বাঙ্গাল ও ওড়িয়াদের লইয়া ঠাট্টা তামাশা করিতে ছাড়ে না। আমিও ছাড়িতাম না। বাঙ্গাল ও ওড়িয়াদের লইয়া ঠাট্টা তামাশা করা আমাদের এদেশীয়দের কৌতুক করা স্বভাবজাত। ভাষাই ইহার কারণ। এখন আর আমার মনে সেরকম কোন প্রবৃত্তি নাই।

'তিন দিন এই ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে কাটাইবার কারণ কোন গন্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আমার কোন গন্তব্য নাই। কোন একদিকে গেলেই হইল। তথাপি কোন পথে যাইব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। পশ্চিমে দুইটি বড় জাঙ্গাল রহিয়াছে। একটি হাওড়া হইতে দিল্লি পর্যন্ত সাবেকী পাঠান বাদশার রাস্তা। আমরা শাহী জাঙ্গাল বলিয়া থাকি। নামে শেরশাহ. আসলে বিভিন্ন অঞ্চলের অধীন ফৌজদাররাই এই শাহী জাঙ্গাল তৈরি করিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর পথটি রাণী অহল্যাবাঈ নিজ ব্যয়ে তৈরি করিয়াছিলেন। উহা হরিপাল চাঁপাডাঙ্গা আরামবাগ বিষ্ণুপুরের দিকে গিযাছে। সাতগাঁ হইতে যে বাদশাহী সড়কটি মুরশিদাবাদের পশ্চিম দিক দিয়া পুরনো গৌড়ের দিকে গিয়াছে. সেই রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার এই পশ্চিম তীরের কোন রাস্তা দিয়া উত্তরে যাইতে ইচ্ছা নাই। সকলই আমার পরিচিত পথঘাট। সাতগাঁও সেলিমাবাদ মাদারুণ এই সব অঞ্চলে পরিচিত লোকের অভাব নাই। আমি উহা পরিত্যাগ করিতে চাহি।

'শেষ পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব তীরে যাওয়া স্থির করিলাম। একটি তীর্থযাত্রীবাহী বড় নৌকা চতুর্থ দিন ভোরের গোনে (জোয়ারে) চাকদহে যাইতেছিল। আমি সেই নৌকাতেই আরোহণ করিলাম। মাঝিদের সঙ্গে আগেই কথা হইয়াছিল। পূবতীরের এ সব অঞ্চল আমার কাছে অপরিচিত। অতএব পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই।

'ভোরের দিকে এই প্রথম হেমন্তের সামান্য কুয়াশা পূর্বের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সূর্যোদয়ে সামান্য বিলম্ব হইল। আকাশ রাঙ্গা হইল। নদীর জলের রং বদলাইল। ঈষৎ উত্তরের বাতাস মাঝে মাঝে আসন্ন শীতের আভাস দিতেছে। দক্ষিণ বাতাস থাকিলে নৌকার পাল খাটানো হইত। স্রোতের টান থাকিলেও দুই মাঝি দাঁড় বাহিতেছিল। আর এক মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। আমি পূর্ব দিকের আকাশ গ্রাম ও অরণ্য দেখিতেছিলাম। ইচ্ছা করিয়াই পশ্চিম দিক

হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এক দন্ড চলিবার পরে আর পারিলাম না। পশ্চিম দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম। কুন্তী নদীর মোহনা আমার চোখে পড়িল। অথচ ফিরিয়া চাহিব না ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু দেহ যেন আমার ঘাড় ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া দিল। আবার আমার চোখের সামনে, সেই গ্রাম গৃহ পরিবারের মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল।

'অন্যমনস্ক হইয়া কখন মুখ ফিরাইয়াছি জানি না। আমার দৃষ্টি মাঝিদের বাহিত দাঁড়ের ওপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। দেখিতেছি, দাঁড় দুইটি জলে ডুবিতেছে উঠিতেছে। বারংবার এইরূপে ডুবিয়া উঠিয়া এক সময়ে মাঝি ক্ষণিকের জন্য ক্ষান্ত দিল। দাঁড় তুলিয়া রাখিয়া পেট কোমরের কাছে কাপড়ে রাখা কয়েক মুঠা চিড়া মুড়ি চিবাইল। নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলিল। আবার দাঁড় বাহিতে লাগিল। সহসাই আমার মনে হইল মাঝি নিয়তির ন্যায় দাঁড়গুলিকে বাহিতেছে। আর দাঁড়গুলি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনের মত উঠিতেছে পড়িতেছে। তাহাদের বিরাম নাই। একমাত্র মাঝির ইচ্ছায় ক্ষণিকের জন্য সুস্থির হইতে পারিতেছে।

'দাঁড় জড়বস্তু। মানুষের জীবনের সঙ্গে তাহার তুলনা চলে না। ইহা আমার মানসিক অবস্থার একটা কুহক হইবে। তবু মনে হইল, দাঁড়গুলি জীবন্ত মানুষের ন্যায়, যাহাদের অপরে চালনা করে অথচ যেন তাহার নিজস্ব অস্তিত্ব রহিয়াছে। আমার অন্তরে একটা ক্ষুব্ধ বিষাদের সঞ্চার হইল।

'দ্বিপ্রহরের অনেক আগেই নৌকা চাকদহে পেঁছাইল। একটি বাঁধানো ঘাটে বিস্তর নরনারী স্নান করিতেছিল। ঘাটের সংলগ্ন একটি গঙ্গাযাত্রীর ঘরও রহিয়াছে। ত্রিবেণী এত নিকটে থাকিতে এই গঙ্গাযাত্রীর ঘরে কে মুমূর্ষুকে লইয়া আসিবে। ত্রিবেণীতে মরায় পুণ্য আছে। অবশ্য চাকদহেরও যথেষ্ট নাম ডাক আছে। যশোহর খুলনা হইতে আগত গঙ্গাস্নানযাত্রী ও আমার মত গঙ্গাযাত্রীদের এখানেই লইয়া আসে। গঙ্গার জল স্পর্শই মূল বিষয়। পূবপারের যাত্রীরা ত্রিবেণীকে অপর তীর ভাবিয়া দূর জ্ঞান করে। যাহাদের তীর্থ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বেশি, তাহারা ত্রিবেণীর ঘাটে যায়। এখন দেখিতেছি, চাকদহ বেশ জনপূর্ণ, সম্পন্ন স্থান।

'সম্ভবতঃ গ্রামের কোন সম্পন্ন ব্যক্তি ঘাট সংলগ্ন গঙ্গাযাত্রীর ঘর নিজেদের পরিবারের জন্য করিয়াছে। আজকাল অর্থশালী ব্যক্তিরা অনেকেই এইরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যদিকে আর একটি উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী দেখিয়াই বোঝা যায় উহা কোন ধনী পরিবারের স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাট। গঙ্গার জলে শাল কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া চারিদিকে বাঁশ ও কঞ্চি ঘিরিয়া অন্তরাল সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঘাটের এই পর্দাপোষের কারণ, যাহাতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের স্নান কেহ দেখিতে না পায়।

'আমাদের বাড়ি কুন্তি নদীর ধারে। এইরূপ ঘাট আমাদেরও আছে। সেই ঘাট আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ঘাটে যাইবার প্রাচীর সংলগ্ন দরজা আছে। দরজার দুই পাশে প্রাচীর ঘেরা। আমাদের পরিবারের সুবিধা, স্ত্রীলোকদের

দোলায় (ডুলি) বা মাহাপায় (পাল্কী বিশেষ) করিয়া ঘাটে যাইতে হয় না। সীমানার পাঁচিলের ধারেই নদী। গঙ্গা হইতে দূরে যাহারা থাকে তাহাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদের দোলায় বা মাহাপায় করিয়া ঘাটে আসিতে হয়।

'চাকদহ সম্পন্ন গ্রাম। হাটও বড়, বিশেষতঃ শস্যের আমদানি বিস্তর হইয়া থাকে। গঙ্গার তীরে অনেকগুলি বড় বড় মালবাহী নৌকা দেখিয়াছি। নৌকায় মহাজনরা এই সব অঞ্চলে আসিয়া নগদ মূল্যে শস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতায় লইয়া যায়, সেখানে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কাটোয়ার মত এখানে স্বর্ণকার বা বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ভিড় নাই। নদীতীরে মাল বোঝাই করিয়া রাখিবার গুদাম ঘরও নাই। বিদেশী মহাজনরা হাটের আড়তদারদের সঙ্গে দর কষাকষি করে। আর কৃষকরা শস্য লইয়া আড়তদারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে। এই সময়ে আউস ধান্যের বিক্রয় বেশি। মূল্য নিরূপণের অধিকার তাহার নাই। সবই ব্যবসায়ীর হাতে। কৃষকরা কৃপার পাত্র, আড়তদারদের হাতে-পায়ে ধরিয়া এক আধ পয়সা মূল্য বাড়াইবার জন্য ব্যাকুল।

'ইহা আমার অজানা কিছু নহে। কয়েকটা দিন হাটেই থাকিয়া গেলাম। রাঁধিয়া খাইবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। আড়তদারদের মালবাহীদের কিছু চাউল দিতে তাহারাই খাইতে দিয়াছে। তাহারা নিজেরাই রাঁধিয়া খায়। আমি মালবহনের কাজ করিতে চাহিয়াছিলাম। অপরিচিত মানুষকে আড়তদারেরা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। মালবাহীরাও আমাকে অপরিচিত জানিয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়াছে। আমার পরিচয় নিবাস চাকদহে আগমনের কারণ ইত্যাদি বহুতর কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে আমি অনায়াসেই মিথ্যা বলিয়াছি। জাতিতে তিলি বিসূচিকায় সমস্ত পরিবারের লোক উৎসন্ন হইয়াছে। আমি গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছি। তাহারা আমাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করে নাই। কেবল একজন মালবাহী একত্রে কলাপাতা পাতিয়া খাইতে বসিয়া সহসাই একদিন বলিয়া উঠিল, তোমার ডান হাতের দুই আঙ্গুলে দাগ দেখিয়া মনে হয়, তুমি আংটি পরিতে।

'আমি অন্তরে চমকাইয়া উঠিলেও সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলাম, নানা রোগ ব্যাধিতে গ্রামের ওঝা আমাকে মধ্যমায় ও অনামিকায় তামা ও লোহার দুইটি মন্ত্রপূত আংটি দিয়াছিল। যখন পরিবারের সকলেই বিসূচিকায় (ওলাউঠা-কলেরা) উৎসন্নে গেল, তখন আর নিজেরও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় নাই। সেই কারণে মন্ত্রপূত তামা-লোহা ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি তাহারা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বলিয়াছিল, তোমার কথাবার্তা শুনিতে আমাদের অপেক্ষা ভিন্নতর, যেন সদ্বংশজাত কর্তা ব্যক্তিদের ন্যায়। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, উহা সঙ্গগুণ মাত্র। লেখাপড়া কিছুমাত্র জানি না।

'ক্রমে তাহাদের অবিশ্বাস বাড়িতে পারে, এবং এখানে আমার অন্ন জুটিবার মত কর্মসংস্থানও হইবে না, এইসব ভাবিয়া স্থান ত্যাগ করিলাম। স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে, আমি একটি অদ্ভুত কাজ করিলাম। এক কৃষক মাত্র এক মণ

আউস ধান লইয়া আসিয়াছিল। কথায় কথায় জানিলাম, সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঐ ধান বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। জমিদারের শ্রাবণী প্রণামী দিতে গিয়া, এক পেয়াদার কাছ হইতে চারি আনা কর্জ করিতে হইয়াছিল। এই কার্তিকে সুদসমেত তাহা বার আনায় দাঁড়াইয়াছে। না দিতে পারিলে, সে তাহার আমনের ধান কাটিয়া লইয়া যাইবে। অথচ এই ধানই তাহার পরিবারের শেষ খাদ্য। কুটিবার অবকাশ হইল না। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, এই ধান বিক্রয় করিয়া, অনাহারে থাকিয়াও তাহাকে পরবর্তী ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

'ইহা সমস্ত দেশের গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন শত সহস্র ঘটিতেছে। আমার পাইক পেয়াদারা অনেক প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। ঐ কর্মকে আমরা আত্ম-রক্ষার অধিকার বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু তখন নিয়তির কথা মনে আসে নাই। এখন মনে হইল, এই লোকটি তাহার নিয়তির দ্বারা চালিত হইতেছে। সেই দাঁড়ের কথাই আমার মনে আসিল। নিয়তি আমার কাছে কুচক্রী ছাড়া আর কিছু নহে। একমাত্র দুর্ভাগাদের প্রতিই তাহার অমোঘ আঘাত আসিয়া পড়ে।

'এই প্রথম আমার মনে হইল, নিয়তির বিরোধিতা করাই শ্রেয়। অলক্ষে-থাকিয়া সে সমাজে সংসারে নানা কারণ ও ঘটনার মধ্যে নিজের কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছে। নির্বিকারত্ব ও বিষাদের পরিবর্তে, আমার মনে বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। আমি কৃষকটিকে তাহার প্রাপ্যের অধিক এক টাকা দিয়া ধান কিনিলাম। অবশ্য ইহার মধ্যে আমারও একটি উদ্দেশ্য ছিল। আমি তাহার গৃহে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বলিলাম, তোমার সংসারে আমার দ্বারা কোন সুসার হইলে, আমাকে কয়েকদিন দুই মুষ্টি অন্ন দিও।

'কৃষকটি প্রথমে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় চোখে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। জীবনে এইরকম প্রস্তাব তাহাকে কেহ দেয় নাই। আমি মালবাহীদের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, ইহাকেও সেইরূপই দিলাম। লোকটি আমার প্রস্তাবে রাজী হইল। আমি তাহার সঙ্গে চলিলাম। সে উত্তর পূর্বে গ্রাম জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রায় চারি ক্রোশ হাঁটিয়া চলিল। জীবনে কখনও এত অধিক পথ হাঁটি নাই। বিশেষ করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে কষ্ট হইতেছিল।

'কৃষকটি ও তাহার স্ত্রী ছাড়া ঘটনাটি কেহ জানিতে পারিল না। আমিই তাহাকে কাহাকেও কিছু প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সে গৃহে ফিরিয়া আগে স্ত্রীকে সকল কথা বলিল। আমি কিছুটা সন্দিগ্ধ ছিলাম, তাহার স্ত্রী ঘটনাটিকে একটি অলৌকিক উৎপাত ভাবিয়া চিৎকার শুরু করিয়া দিবে। কিন্তু সে তাহা করিল না। ঘোমটার আড়াল হইতে, দরিদ্র বধূটি আমাকে কয়েকবার দেখিল। তাহার বয়স বিশ বাইশের বেশি নহে। সন্তান সংখ্যা চার। উলঙ্গ শিশুগুলি নিতান্তই কুকুর শাবকের মত হাসিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিয়া খেলিতেছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। পরের দিনই কৃষক জমিদারের পেয়াদার পণ মিটাইয়া ফিরিয়া আসিল।

'কিন্তু তিন দিন অতিক্রম করিতেই, কৃষক করজোড়ে জানাইল, সে আর

আমাকে অন্নমুষ্টি দিতে অক্ষম। তাহার প্রতিবেশীরাও নানারকম প্রশ্ন করিতেছে। কারণ, এই সময়ে চাষের কোন কাজ নাই, অথচ সে কী কাজে একটি লোককে ঘরে রাখিয়া খাওয়াইতেছে। ঘরে আমি স্থান পাই নাই। একটি মাত্র খড়ের চালার ঘর। দুগ্ধবতী গাভী নাই, কেবল চাষের এক জোড়া বলদের জন্য একটি ভাঙগা চালা। তাহারই এক পাশে কৃষক বধূটি তাহার রান্নাবান্না করে। সেই ঘরেই আমি তিন রাত্রি যাপন করিয়া, বিদায় হইলাম। সম্ভবতঃ আমার নিয়তি অলক্ষ্যে হাসিতেছিল। আমার অন্তর ক্রোধে জ্বলিতেছিল। কিন্তু কৃষক দম্পতির প্রতি আমার মনে কোন বিদ্বেষ আসে নাই। তাহার মত গরীব কৃষকের পক্ষে, অসময়ে একটি লোককে গৃহে রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না।'



'এইভাবেই চলিয়া মাসখানেক পরে বহরমপুরে উপস্থিত হইলাম। বহরমপুর হইতে, গ্রামান্তরের ভিতর দিয়া মুরশিদাবাদে যাইবার রাস্তাটি আমার পরিচিত। এক রাত্রি বহরমপুরে থাকিয়া, মুরশিদাবাদের দিকে রওনা হইলাম। অথচ মুরশি-দাবাদ যাইবার কোন অভিপ্রায় আমার নাই। অবশ্য এখন আর আমাকে দেখিয়া কেহ চিনিতে পারিবে না। চুল দাড়িতে আসল মুখাবয়বটির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে ধান পাকিয়াছে। মুরশিদাবাদ যাইবার পথে, মাঠে ধানের বোঝা মাথায় করিয়া লোকের গৃহে পৌঁছাইয়া, অন্ন সংস্থান করিলাম। ধান কাটিতে যাই নাই, তাহা হইলে আমার কৃষি কাজের অকর্মণ্যতা প্রকাশ হইয়া পড়িত।

'নাটুর দেওয়া সাত আট টাকার বেশি খরচ হয় নাই। ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করি নাই। পথ চলিতে, সর্বত্রই গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, কাজের বিনিময়ে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছি। ঘেসুড়ের সঙ্গে সারাদিন ঘাস কাটিয়া, তাহাদের সঙ্গেই ঘাস বিক্রয় করিয়া, শুঁড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া গুড়জাত নিকৃষ্ট মদ্য পান করিয়াছি। মত্তাবস্থায় তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছি, অশ্লীল গান করিয়াছি। মানুষের বাসের অযোগ্য, তাহাদের ভাঙা দাওয়া, ছিন্ন খড়ের চালের ঘরে বাস করিয়াছি। তাহাদের স্ত্রীরাও সুরাপানে অভ্যস্ত। আমরা যাহাকে সতীত্বের নীতিবোধ বলিয়া জানি, তাহাদের স্ত্রীরা সেই সব নীতিবোধের তেমন মূল্য দেয় না। হাড়ি ডোম প্রতিবেশীরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রতিদিন ভরা পেট খাইবার নিশ্চয়তা কাহারও নাই। কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইহাদের স্ত্রীরা হেন বাক্য নাই, যাহা উচ্চারণ করে না। পুরুষরা যতক্ষণ সম্ভব, সহ্য করে, তারপরে স্ত্রীদের ধরিয়া পিটাইতে আরম্ভ করে। স্ত্রীরা পলাইয়া যায়।

'সমাজের এই চিত্র আমার চোখে নতুন নহে। কিন্তু ইহাদের সংস্পর্শ হইতে বহু দূরে থাকিয়াছি। ইহারা আমার কাছে একরকম অপরিচিত অজ্ঞাত, ইহাদের

অস্তিত্বের বিষয় কখনও ক্ষণিকের জন্যও মনে আসিত না। অথচ দেখিলাম, আমি অনায়াসেই ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়াছি, ইহাদের মত জীবনযাপন করিয়াছি। পথে চলিতে, ইহা সাময়িক ঘটনা মাত্র। উহাদের অন্ন ব্যঞ্জন মুখে লইতে বমনোদ্রেক হইয়াছে। কিন্তু অবস্থান্তরে আমি সমস্ত বিকারমুক্ত হইয়াছি। অতীত বলিয়া কিছুই রাখিতে চাহি নাই। আমাকে দেখিয়া এখন কেহ বিশ্বাস করিবে না, বৎসরের একটি দিনে মা আমাকে সোনার থালায় অন্ন পরিবেশন করিতেন। সেই দিনটি বিশেষ তিথি নক্ষত্রে মিলিত আমার জন্মদিন।

'পিতামহ সাতটি সোনার থালা, তাঁহার চারি পত্নীর সন্তানদের ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাকে দুইটি দান করিয়াছিলেন। আমার পিতা বা আমি আর সোনার থালা গড়াইতে পারি নাই। স্ত্রীদের এবং পুত্রবধূদের কিছু অলঙ্কার দিতে পারিয়াছি। সে সবই এখন আমার কাছে অতীত। নাটুদের বিদায় দিয়া, জামাই জাঙ্গালে দাঁড়াইয়া আমি গলার যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আমি সমস্ত বর্ণ বিভাগ ত্যাগ করিয়াছি। পরিচয় দানের জন্য কেবল রাশ্যাশ্রিত রমাকান্ত নামটি রাখিয়াছি। বাকি পদবী উপাধি জাত সকলই ত্যাগ করিয়াছি। আমি আমার সমাজ সংসার হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছি। সেই সমাজ সংসারের তুল্য অন্য কোথাও আমি আর যাইব না।

'দুই মাস কাটিয়া গেল। আমি দরিদ্র কৃষক সমাজে অন্ত্যজদের সঙ্গে মিশিয়া দেখিলাম আমাদের প্রাণের ও মনের শক্তি অপেক্ষা ইহাদের শক্তি অনেক প্রবল। ইহারা নিয়তির কথা চিন্তা করে না। জীবনকে তাহাদের নিজেদের স্বরূপেই দেখিতেছে, বাঁচিবার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিটি দিন বাহিত করিতেছে। শাস্ত্রকারদের নিকট হইতে ইহারা দূরে থাকে। ব্রাহ্মণ দেখিলে ভক্তি করিয়া প্রণাম করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে ইহার কোন অনুভূতি নাই। কেবল ইজারাদার, পত্তনিদার পোদ্দার পেয়াদা পাইকদের এবং স্থানীয় থানাদারদের ইহারা যমতুল্য ভয় পায়। মুসলমানের পরিবর্তে ফিরঙ্গরা নবাব হইয়াছে, ইহাই জানে। এবং ফিরঙ্গ নবাবের হুকুম পালন করিতে, তাহাদের মতে যমের অরুচি, ইজারাদার পাটোয়ার তালুকদার—যাহা আমিও ছিলাম—আর তাহাদের চেলাচামুণ্ডারা কোনরকম অত্যাচার করিতেই বাকি রাখে না। কোম্পানীর বিনশুল্কে বাণিজ্যের ইহাই অনিবার্য ফল।

'সেইজন্যই বলিতেছিলাম, আমাকে আর কেহ এখন চিনিতে পারিবে না। জামদানে দোলাই (জামা বিশেষ) চন্দ্রকোণা ধুতি জোব্বা চোগা চাপকান পরিহিত বৈদূর্যকান্তি রায় প্রকৃতই মরিয়াছে। একটি নিমাস্তীন, মৃতদেহ সংকারের খুইয়াঁ (খাদি) ধুতি, নাটুর কাছা লইবার বস্ত্র দুই খণ্ড ইতিমধ্যেই রঙ বদলইয়াছে। পুরানো চন্দ্রকোণা ধুতি, যাহা পরাইয়া আমাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হইয়াছিল তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ হওয়ায়, ধুতির পরিবর্তে গায়ে চাদরের মত ব্যবহার করি। কখনও বা মাথায় বাঁধি। ইতিপূর্বে মুর্শিদাবাদ বা বর্ধমান রাজবাড়িতে রাজস্ব বিভাগে যাইবার সময় যে পাগ (পাগড়ি) ব্যবহার করিতাম এখন

মাথায় জড়ানো ছিন্ন ময়লা ধুতিটি জড়াইয়া নিজের মনেই হাসি। চুলে তেল নাই, চিরুণীর ব্যবহার নাই। ছে। আমি এখন শত সহস্রের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছি। ইহাই যদি নিয়তির চালনা হয়, হউক। আমি নির্বিকার উদাস চিত্তে অনায়াস জীবন যাপন করিতেছি।'



'মুরশিদাবাদ যাইবার পথে, যখন একটি কৃষক পরিবারের কাজ করিতেছি তখনই গ্রামের একটি পরিবারের দুর্দশা দেখিলাম। সমস্ত ধান মাঠ হইতে তুলিবার আগেই, জমিদারের পাইকরা আসিয়া সর্বস্ব তুলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাদের খাজনা নাকি অনেক বাকি পড়িয়াছিল। সমস্ত ধানেও তাহা শোধ করিবার উপায় ছিল না। হাল বলদ গরু বাছুর, এমন কি ঘরের সামান্য বস্ত্র কাঁথা মাদুর চুপড়ি কুলা কিছুই নিতে বাকি রাখিল না। কাঁসার দুই একখানি বাসন, স্ত্রীলোকদের গলার সামান্য পুতির মালা, রাঙ ও সীসার বালা পর্যন্ত কাড়িয়া লইল।

'পরিবারের পুরুষেরা পাইকদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা লজ্জা বিসর্জন দিয়া, অনাবৃত বুক চাপড়াইয়া, বাঁশের খুঁটিতে মাথা ঠুকিয়া রক্তপাত করিল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কোন প্রার্থনা জানাইল না। বরং বলিল, ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকিত, তবে এরূপ হইত না। যে বিধাতা ইহা চাহিয়া দেখিতেছে, সেই অনামুখোর মুখে ছাই পড়ুক। অবস্থান্তরে ঈশ্বরের মুখে ছাই দিতে কুণ্ঠা নাই। কারণ সংকটকালেই মানুষের হৃদয়ে সত্যের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নাই, এই সত্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

'এইরূপ দুর্দশা নতুন নহে। চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছি। চিরকালের দেখার মধ্যে ইহাকে অনিবার্য ভাবিয়া নির্বিকার ও উদাসীন থাকিতাম। এখন আর সেই চোখে দেখিতে পারিতেছি না। প্রবলের অত্যাচারের সামনে, ভয় কী নির্মম সংক্রামক, তাহাও যেন এই প্রথম অনুভব করিলাম। ইহাও নিয়তির বিধানের মত বোধ হইতেছে।

'মুরশিদাবাদ আমাকে কেন টানিতেছে, জানি না। পূর্ব লীলাক্ষেত্র দেখিবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার মনে নাই। তথাপি আমি মুরশিদাবাদের দিকেই চলিলাম। নগরের প্রান্তে পৌঁছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখন নগরে প্রবেশ করিতে গেলে, থানাদারের হাতে পড়িতে হইতে পারে। গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ মুখেই, একটি গৃহে আলো জ্বলিতে দেখিয়া সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। মাটির প্রাচীরের গায়ে দরজাটি খোলা। ভিতরের উঠোনে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কী করিব, ইতস্ততঃ করিতেছি, এই সময়ে একটি স্ত্রীলোক ভিতরের এক পাশ হইতে দরজার

কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার আবছায়ায় তাহাকে প্রৌঢ়া বিধবা বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি ভাঙা অথচ বিস্বিষ্ট। জিজ্ঞাসা করিল কে তুমি, কী চাও। আমার জবাবের পূর্বেই উঠোনের অপর দিকের ঘর হইতে অন্য এক রমণীর স্বর ভাসিয়া আসিল, কে আসিয়াছে।

'দরজার সামনের স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, চিনি না। ভিতরের রমণীর স্বর শোনা গেল, চোর নাকি? এই সন্ধ্যাবেলাতেই সিঁদ কাটিতে আসিয়াছে। কথার পরেই রমণীর হাসি শোনা গেল।

আমি বলিলাম, চোর তস্কর কিছুই নহি। অনেক দূর হইতে আসিতেছি। কিন্তু এখন নগরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেছি না, থানাদার আটকাইয়া গারদে পুরিতে পারে। যাহাই হউক, আমি গ্রামের মধ্যে যাইতেছি, রাত্রিটা কেহ নিশ্চয় দয়া করিয়া আশ্রয় দিবে।

আমার কথা শেষ হইবার আগেই ভিতরের রমণীর স্বর ভাসিয়া আসিল, মা উহাকে আমার কাছে লইয়া আয়। দরজার স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল, কী দরকার। যমেরা কখন আসিয়া পড়িবে, ঠিক নাই। এই অপরিচিতকে কেন বাড়ির মধ্যে ডাকিতেছিস। উত্তরে রমণীর তীক্ষ্ণস্বর শোনা গেল, তোকে যাহা বলিতেছি, তাহাই কর। তারপরে নিজের হুঁকা লইয়া তামাকু টানিতে যা।

'আমি বিষয়টি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোকটি দরজা হইতে সরিয়া বলিল, এস। আমি দরজা অতিক্রম করিয়া উঠানে পা দিলাম। স্ত্রীলোকটির পিছনে পিছনে, আলোকিত ঘরটির দিকে যাইতে যাইতে লক্ষ্য করিলাম, আরও দুইটি ঘর রহিয়াছে। সে ঘর দুইটি নিতান্তই ছোট আর নীচু। আমি যে ঘরের পিড়ার উপর উঠিলাম, উহা ভাল চারচালা বাংলা ঘর। ঘরের দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইতে, ভিতরে দক্ষিণে লক্ষ্য পড়িল। একটি খট্টার (খাট) উপরে, বিছানো সুশয্যায় এক যুবতী, গালে হাত রাখিয়া কাত হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। বৃহৎ আয়তনের চৌকোণা সীসকের (কাঁচের) আধারে উজ্জ্বল মেমাবাতি জ্বলিতেছে। ঘরের মধ্যে উগ্র আতরের গন্ধ বহিতেছে।

'সন্ধ্যাবেলায় গৃহস্থের বাড়ির পক্ষে দৃশ্যটি একান্তই বিপরীত। বাহিরে তুলসীতলা দেখি নাই, বাতিও দেখি নাই। এই সময়ে কোন গৃহবধূ খাটে এই-রকম শুইয়া থাকে না। মনে হইল তাহার অঙ্গে জামদানি শাড়ি ও কাঁচুলি রহিয়াছে। লোটন খোঁপায় সোনার কাঁটা পাতার দু একটি ঝুমকা দেখা যাইতেছে। শরীরে যৌবন উপছাইয়া পড়িতেছে। কোমরে যথার্থ রূপার কিংকিনি, আলতা পরা পায়ে খাগমল, হাতে চুড়ি ও বলয়, গলায় সোনার চন্দ্রহার। চোখে কাজল, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা কিন্তু মাথায় ঘোমটা নাই। প্রথমে আমার মনে হইল, ধনী মুসলমান রমণী হইবে। কিন্তু তাহার কথায় কিছু পূর্বাভাস পাওয়া যাইত, তাহা পাই নাই। তাহা ছাড়া, ঘরের শাল খুঁটিতে একটি দুর্গা প্রতিমার পট ঝুলিতেছে। অবশ্য উহা মুসলমানের ঘরেও অনেক সময় দেখা যায়। বিশেষ করিয়া, যে হিন্দু রমণী মুসলমানকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার ঘরে এরকম পট

থাকা অস্বাভাবিক নহে।

'রমণী যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই হাসিয়া বলিল, চোর না হইলেও তুমি নিশ্চয় রাতকানা ভিক্ষুক। চোখে দেখিতে পাও তো। বলিলাম, পাই। রাত-কানাও সাজি নাই, তা হইলে আগেই নগরের পথে পথে ফিরিতাম। কিন্তু নগরে প্রবেশ করিতে দেরি হইয়া গিয়াছে। আজকাল থানাদাররা অকারণে নানাপ্রকার সন্দেহ করে। সেইজন্যই স্থির করিয়াছি, রাত্রিটা গ্রামে যাপন করিয়া, ভোরবেলা নগরে যাইব। রমণী হাসিয়া বলিল, গ্রামেও যাইতে পারিবে না। কোন এক সাহেবকে কে দুইদিন আগে রাত্রে গায়ে জল ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার ফলে, গ্রামে তিন গোরা আলাদা থানা বসাইয়াছে। গ্রামের লোকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া মারপিট করিতেছে। ভাবিতেছে, উত্তর দেশ হইতে (রঙপুর) চুয়াড়েরা বুঝি মুরশি-দাবাদে ধাওয়া করিয়া আসিয়াছে। গ্রামের লোকেরা তটস্থ হইয়া রহিয়াছে। কেহ ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস পাইতেছে না। একমাত্র আমার জার দত্তজা মহাশয়টি গ্রামে লাঠি ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে, সে মুরশিদাবাদে নতুন কুঠির বাবু হইয়াছে, গ্রামটিও তাহার তালুক। তিন গোরা তাহার বাড়িতেই থানা বসাইয়াছে।

'যুবতীর জার (উপপতি) কথায় বুঝিলাম, সে গ্রামের তালুকদার দত্তজার রক্ষিতা, অর্থাৎ গণিকা। ঘটনা শুনিয়া বুঝিলাম, সে মিথ্যা বলে নাই। সাহেবের গায়ে জল ঢালিয়া দিবার মত সাহসী লোকও মুরশিদাবাদ নগরে আছে। একদিক হইতে ভাগ্য ভালই বলিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা ছিল না। অপরিচিত বহিরাগত, তদুপরি আমার চেহারা পোশাক দেখিয়া চুয়াড় ভাবিতেও পারে। কিন্তু আমি হাসিয়া বলিলাম, চুয়াড়েরা কি প্রকারে আসিবে। বিশ বাইশ বছর আগেই তাহাদের দমন করা হইয়াছে।

'যুবতী গণিকা আমার কথায় উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, চুয়াড় দমনের কথা জানি না, তোমার মুখে শুনিলাম। কিছু উৎপাত ঘটিলেই চুয়াড়দের কথা শুনি, বর্গীদের কথাও শুনি। তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, সত্যই তুমি নিতান্ত চোর ডাকাত নহ। তবে কিছুটা চুয়াড়ের মত দেখাইতেছে। তোমার হাতে দণ্ড কমণ্ডলু থাকিলে সাধু সন্ন্যাসী মনে হইত। কিন্তু তুমি এখন কি করিবে। আমার এখানে যে কোন সময়েই গোরারা আসিতে পারে। বলিতে বলিতে যুবতী উঠিয়া বসিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তালুকের মালিক দত্তজার প্রেয়সী, তোমার এখানে গোরা আসিবে কেন।

'যুবতী আবার খিলখিল হাসিতে লুটাইয়া পড়িয়া, একটা তাকিয়া তুলিয়া খাটের একদিকে ছুঁড়িয়া দিল। তাহার অলংকারের ঝনাৎকার শোনা গেল। খাট হইতে নামিয়া আসিল, জামদানির আঁচল লুটাইতেছে। দুই হাত ছড়াইয়া বলিল, দেখিতেছ না আমি কেমন বিবিটি সাজিয়া রহিয়াছি। সারা দিনে ও রাত্রে তিন গোরা প্রস্রাব পাইলেও এখানে ছুটিয়া আসে। ইহা আমার জারের হুকুম, গোরাদের খুশি রাখিতে হইবে। তাহারা দেশি সেপাই লইয়া যখন ইচ্ছা এক একজন আমার ঘরে আসিতেছে, রমন করিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। আমার শাড়ি ছাড়িবার সময়

হয় না, উলঙ্গ শুইয়া থাকিলেই ভাল হয়। তাহারা আসিতেছে, রমন করিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। আর একজন আসিবার ফাঁকে আমি খাইয়া লই। আবার একজন আসিয়া চলিয়া যায়। আমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি। আবার একজন আসে, চলিয়া যায়, আমি কিঞ্চিৎ ঘুমাইতে চেষ্টা পাই। দুইদিন দিনে রাত্রে এইরকম চলিতেছে। কিন্তু আমার দত্তজার হুকুম সাজিয়া থাকিতে হইবে। তাই সাজিয়া আছি। কিন্তু দেখ আমার চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে, উরু নাড়িতে পারিতেছি না।

'যুবতী সমস্ত কথাগুলিই গ্রাম্য অশ্লীল ভাষায় বলিতেছিল। কিন্তু উহা প্রকৃত অর্থে অশ্লীল নহে, ঘটনার অবিকল বিবরণ। সে জার বলে নাই, রমন বলে নাই, সবই অশ্লীল ইতর ভাষায় বলিল। গোরারা এক একজন আসিতেছে, ভোগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, সে খাইবার অবকাশ পাইতেছে, আবার গোরা আসিতেছে, ভোগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, সে বিশ্রাম করিতেছে, আবার গোরা আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে আমার বিবমিষা হইতেছে। নৌকার দাঁড়ের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ইহা যেন একরূপ সেই প্রকারের ঘটনা। মানুষের জীবনের মত, কুচক্রী নিয়তির অমোঘ নির্দেশে চালিত হইতেছে। নিরন্তর কষ্টের মধ্যে, আহার বিশ্রাম নিদ্রার অবকাশ একমাত্র মুক্তির স্বাদ। যুবতী হাসিয়া বলিলেও আমি বুঝিতেছি, তাহার সমস্ত অন্তর ক্রোধে ঘৃণায় উথলাইয়া উঠিতেছে। শুনিয়া আমি নত মস্তক হইলাম।

'যুবতী আরও নানাপ্রকারে তাহার দেহের দুর্গতির ব্যাখ্যা করিল, যাহা শুনিয়া আমার বমনোদ্রেক হইল। তারপরে বলিল, তবে গোরারা বেশি রাত্রে আসিতে ভরসা পায় না। তাহারা আমার অন্য কোন ঘরেও প্রবেশ করে না। তুমি ইচ্ছা করিলে, অন্য ঘরে রাত্রিটা থাকিতে পার। কিছু খাইতেও দিতে পারি। তবে সাবধানে থাকিও, কোনরকম শব্দ করিও না। বলিয়া সে তাহার মাকে ডাকিয়া বলিল, ইহাকে রাত্রে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দে। কিন্তু দেখিস, জীবনভর বেশ্যা-বৃত্তি করিয়া, আমাকে ডুবাইয়াছিস। লোভের বশে ইহাকে ধরাইয়া দিস না।

'ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। অন্যথায় আমি ফিরিয়া, পশ্চাতের কোন গ্রামে চলিয়া যাইতাম। আমার দ্বিধা দেখিয়া যুবতী ভরসা দিয়া বলিল, তুমি নিশ্চিন্তে থাক। কাল ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইও।'



'মুরশিদাবাদকে দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইল, পূর্বের তুলনায় নগরে নবাবী প্রতাপ ম্লান হইয়াছে। গঙ্গার তীর দ্রুত ভাঙিয়া যাইতেছে। অথচ সাহেবদের সৌধগুলি এক নতুন রূপ লইয়া, নগরের অন্য এক শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। মুরশি-দাবাদ হইতে তুলনায়, কাশিমবাজারের উন্নতি লক্ষণীয়। সাহেবদের রেশম লবন

ও অন্যান্য ব্যবসায়ের কুঠি সবই এখানে। তাহাদের বড় বড় সৌধ কাশিমবাজারকে যেন নতুন রাজধানী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীরা সর্বদাই সাহেব-দের কাছে হাত জোড় করিয়া বেড়াইতেছে। আমার অল্প বয়সে অন্যান্য ফিরঙ্গী-দের দেখিয়াছি, তাহারা কেহ নাই। লোকারণ্য আছে, কেবল ইংরাজদের কাজ করিবার জন্য। দেশীয় লোকদের দোকানগুলি দেখিলে, গ্রামের হাটের দোকানের চিত্র চোখে ভাসিয়া ওঠে। যাহা কিছু, সবই ইংরাজদের কুঠি, ব্যবসা, সৈন্যাবাসকে ঘিরিয়া আবর্তিত হইতেছে। নিতান্ত তাহাদের দালাল ও কর্মচারীরাই কিছু হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের অঙ্গেই একমাত্র জোব্বা আচকান পাগড়ি শোভা পাইতেছে। পালকিতে করিয়া গেলে, সাহেব দেখিলেই, বেহারাদের থামাইয়া, দ্রুত পালকি হইতে বাহির হইয়া হুজুরে সেলাম ঠুকিতেছে।

'চার পাঁচ দিন কাশিমবাজারেই কাটিয়া গেল। পরিচিত প্রায় কাহাকেও দেখিলাম না। মুরশিদাবাদে যেসব গৃহে যাইতাম, যাহাদের চিনিতাম, তাহাদের দেখাও পাইলাম না। পাইলেও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না, আমিও পরিচয় দিতাম না। কাশিমবাজারে গঙ্গার বড় বড় মালবাহী নৌকার মাঝিদের পয়সা দিয়া, তাহাদের সঙ্গেই খাইলাম। এই সব মাঝিরা অনেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলমান। কথা আদৌ বুঝিতে পারি না। বাপফৈ আর ফুঁইসা (পয়সা) ছাড়া মুখে কথা নাই। নগরের অন্যান্যদের তুলনায় ইহাদের সঙ্গে অন্ন গ্রহণে সুবিধা ছিল। ইহারা ঠকাইবার চেষ্টা করে না। কেবল শুকনো মাছের ব্যঞ্জনটি মুখে গেলেই গলায় আটকাইয়া যায়। গন্ধে পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া আসে। কে জানে, কবে হয়তো মানুষের মাংসও খাইব। অতএব গন্ধ-স্বাদ সকলই আমার কাছে পরাস্ত হইল। মুসলমানের সঙ্গে আহার কিছু নতুন নহে। পূর্বেও মুরশিদাবাদে থাকিতে, কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়াছি। পিতামহ বা পিতা বা গৃহে কেহ জানিত না।

'পঞ্চম রাত্রেই সঙ্কল্প করিলাম পরের দিন ভোরেই কাশিমবাজার ছাড়িয়া যাইব। নগর প্রান্তে জলঙ্গীর ধারে, এক তাঁতির ঘরে রাত্রি যাপন করিয়া, ভোর-বেলা বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে লোক চলাচল শুরু হইয়াছে। কেন জানি না, মনটা আবার গঙ্গার পশ্চিম কূলে টানিতেছিল। বিদ্যুচ্চমকের মত গৃহের ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল। ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

'সহসা আমার সম্মুখে একজন ইংরাজ অশ্বারোহী আসিয়া পড়িল। সে আমাকে রাগত স্বরে কিছু বলিল। পাশেই জলঙ্গী নদী বহিতেছে। আমি নদীর কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেবের হাতে একটি চাবুক ছিল। সে চাবুক তুলিয়া আমাকে মারিল। আমি চাবুকটি ধরিয়া ফেলিলাম। সহসাই আমার মস্তিষ্কে কী ঘটিয়া গেল। আমি সাহেবের অপর পার্শ্বে যাইয়া, প্রাণপণ শক্তিতে তাহার অশ্বটির পেটে আঘাত করিলাম। সাহেবের পদরক্ষিত মোজা (রেকাব) হইতে তাহার পাদুকা পরিহিত পা টানিয়া বাহির করিলাম। অশ্বটি হতচকিত হইয়া জলঙ্গীর জলের ঢালুতে লাফাইয়া পড়িল। আমি চাবুক মারিলাম। সাহেব ছিটকাইয়া দূরের জলে পড়িল। ঝটিতি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কাছে কেহ

নাই। চাবুকটি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। দেখিলাম, সাহেব জলের টানে ভাসিয়া ডুবিয়া যাইতেছে, আর তাহার অশ্বটি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীর ধার দিয়া ছুটিতেছে।

'ইতিমধ্যে লোকজন ছুটিয়া আসিল। সকলেই কী হইল কী হইল চিৎকার করিতেছে। আমি বলিলাম, কিছুই বুঝিলাম না। সাহেবের অশ্বটি হঠাৎ লাফাইয়া দৌড় দিল, সাহেব জলে পড়িয়া গেল। তখন জলঙ্গীর জলে সাহেবের হাত দুইটি দুই একবার দেখা দিয়া ডুবিয়া গেল। দুর্ভাগা সাঁতার জানে না। লোকজন বলাবলি করতে লাগিল, নিশ্চয়ই অশ্বটি ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, নতুবা এরূপ হইবে কেন। কিন্তু কেহ সহসা জলে নামিল না। দৌড়াদৌড়ি করিয়া কুঠিতে খবর দিল। কয়েক সাহেব, সেপাই, বিস্তর লোক ছুটিয়া আসিল। কেহ কেহ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু আমি জানি, ইতিমধ্যে সাহেবটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অথচ উহাকে হত্যা করিবার কথা মুহূর্ত পূর্বেও ভাবি নাই। যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা আমাকে কোনরকম বিচলিতও করিল না। সকলের সঙ্গে উদাস হইয়া জলঙ্গীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে ভিড় বাড়িতে দেখিয়া আমি নগরের দিকে চলিতে লাগিলাম। এখন সেই মুহূর্তকালের ক্রোধের লেশও নাই। উত্তেজনা নাই, অনুশোচনা নাই। গামছা বাঁধা পুটলি লইয়া নির্বিকার উদাস হইয়া গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম।'



মুর্শিদাবাদ হইতে, নৌকাযোগে কাটোয়ায় আসিলাম। আমাকে পিতামহের দান সেই গৃহটি দেখিলাম। কেহ নাই, দরজা জানালা সবই বন্ধ। এখানে কেশব-ভারতীর নিকট নিমাই মিশ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে নাপিত ক্ষৌরকার্য করিয়াছিল, তাহার নাম মধু। মধু নাপিতের সমাধি এখানে আছে। অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদের নিবাস কাটোয়ার দূরে অদূরে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেই কারণেই এখানে বৈষ্ণবদের প্রাদুর্ভাব বেশি।

'ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাচীন দৌলতখানা ও ভাঙিয়া পড়া মাটির গড়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। এখনও একটি তোপ গড়ের প্রাচীরে রহিয়াছে। পিতামহ তাঁহার জীবনের শুরুতে এখানেই রাজস্ব বিভাগে কাজ করিতেন। কাছেই দেখিলাম, একটি বৈষ্ণবদের আখড়া রহিয়াছে। সেখানে গিয়া আখড়ার মহান্ত ভক্তানন্দ বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। লোকটি যথেষ্ট বৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে কোমর ডুবাইয়া বসিয়াছিল একটি মাটির বড় জলভরা পাত্রের মধ্যে। কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না। তাহাকে ঘিরিয়া ভক্তবৃন্দরা বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ভেকধারী কয়েকজন নেড়ীও ছিল। বাকি স্ত্রীলোকদের কেশ ও বিন্যাস

ভালই ছিল। অধিকাংশই যুবতী। বাবাজীরা নানা বয়সের। সকলে ভেক নেয় নাই।

'একজন ভাগবত পাঠ করিতেছিল। ভক্তানন্দ আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। আমি বসিয়া গেলাম। কিন্তু ভাগবত পাঠকটির উচ্চারণে প্রমাণ হইতেছিল, তাহার শিক্ষা সামান্য। আমি নিজেই উপযাচক হইয়া বলিলাম, পাঠ ঠিক হইতেছে না, আমাকে দাও। লোকটি বিরক্ত হইয়া আমার দিকে তাকাইল। ভক্তানন্দ যেন রুদ্ধ স্বরে গোঙাইয়া বলিলেন, তাহাই দাও। আমি ভাগবত পাঠ করিলাম। ভক্তানন্দ বড়ই আপ্লুত হইল। পূর্বের পাঠকটিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইল। ভক্তানন্দের নির্দেশে আখড়ায় আমার বাস ও আহারের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

'কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম আখড়ায় সেবাদাসীদের সেবার প্রতি সকলেরই বিশেষ আকর্ষণ। গাঁজার গন্ধে আখড়ার বাতাস সর্বদাই মোদিত থাকে। এখানে মুসলমান ছাড়া, আর কোন বর্ণ ভাগ নাই, জাতি পাতির বিচার নাই। সেবাদাসীদের সঙ্গ করণেও বিচার নাই, তবে বিবাদ বিসম্বাদ আছে। সংসার সমাজ হইতে পতিত পরিত্যক্ত নরনারীরাই এখানে ভিড় করিয়াছে। কোন কোন বিধবা রমণী স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

'নিয়তির বিধানে দেখিলাম একটি যুবতী রমণী আমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রচুর গঞ্জিকা সেবনের সঙ্গে তাহার সঙ্গ মন্দ বোধ হইল না। সে আমাকে সাবধান করিয়া দিল, এখানে অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের কুৎসিত ব্যাধি আছে, আমি যেন কাহারও সঙ্গে শয়ন না করি। কেবল তাহার সঙ্গেই শয়ন করিতে পারি, কারণ সে মাসাধিককাল এখানে আসিলেও কোন পুরুষের সঙ্গে শয়ন করে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই। সে স্বামীসহ আখড়ায় আসে নাই। সে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গৃহের বধূ। এক বছর তাহার স্বামী গত হইয়াছে। তাহার ভাসুর দেবরেরা তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিতেছিল। শাশুড়িও বিস্তর গঞ্জনা করিতেছিল। ইহা কেবল তাহার যৌবন বয়সের জন্য নহে। তাহার কিছু কিঞ্চিৎ জমিজমাও ছিল। তাহার বাবা একজন পরম বৈষ্ণব ছিল। তাহার বৈষ্ণব ভক্তি ছিল। আখড়ার বাবাজী মোহন্তদের প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে এই ভক্তানন্দের আখড়ার নামে, নিজের জমির স্বত্ব লিখিয়া দিয়া, কৃষ্ণের সেবার জন্য এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে। ধর্মস্থানে যে এমন পাপ আছে, সে ভাবিতে পারে নাই। তাহার ভাসুর দেবরদের অপেক্ষা এখানকার বেশির ভাগ বাবাজী আরও খারাপ। তাহার বিবেচনায়, বাবাজীদের অপেক্ষা আখড়ায় যে সব স্ত্রীলোক আসে, তাহারা জীবনের সব কিছু খাইয়া বসিয়াছে। সংসারের বিধিনিষেধ ত্যাগ করিয়া, নিজেদের যদৃচ্ছা যৌনক্ষুধা মিটাইবার জন্য আখড়ায় আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকানেক ধনবানের বিধবা, যাহার তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, তাহারাও নিতান্ত কামের তাড়না মিটাইতে আসিয়াছে। নিজেদের বালিকা কন্যাদের সঙ্গে যোয়ান বৈরাগীর কণ্ঠি বদল করিয়া, জামাই শাশুড়ি একত্র সহবাস করিতেছে। ভক্তানন্দ বাবাজীর তো কথাই নাই। তিনি

একজন অবতার বিশেষ। যাহার প্রতি তাঁহার ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহাকেই ভোগ করেন। কিন্তু এখন উপদংশ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় কেহ তাঁহার কাছে বিশেষ যাইতে চাহে না। যে-সব স্ত্রীলোক নিতান্ত গরীব, কোথাও আশ্রয় খাদ্য নাই, সে-ই উহার বিকারের শিকার হয়। তাহারও সেই দশা হইত, কিন্তু সে সমস্ত শক্তি দিয়া তাহা রোধ করিয়াছে। ভয় দেখাইয়াছে, সে সমাজে ফিরিয়া গিয়া সকল কথা জানাইয়া দিবে। ইহা ব্যতীত, অনেক বাবাজী তাহাকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার কারণও ভোগ। তবে সে যে স্বেচ্ছায় আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহার কারণ, আমি সৎ বলিয়া সে বিবেচনা করিয়াছে। জানে না, সৎ-অসৎ বিবেচনা আমার নাই। আমি মনে মনে হাসিয়াছি, অথচ কেমন একটা ক্রোধ মনে জাগিয়াছে। ইহার কাছেই জানিলাম, ভক্তানন্দ উপদংশের ক্ষতের জ্বালা নিবারণ করিতে, ঠান্ডা জলে নিম্নাঙ্গ ডুবাইয়া রাখে। অনেকেই দুরারোগ্য উপদংশ ব্যাধিতে ভুগিতেছে। ভক্তানন্দবাবাজী নিতান্ত ব্যাধির জ্বালায় জলে নিম্নাংগ ডুবাইয়া বসিয়া থাকে। শুনিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারি নাই।

'এখানে থাকিতে প্রবৃত্তি হইল না। ব্যাধির কথা জানিয়া ইস্তক প্রতিনিয়তই বিবমিষায় ভুগিতে লাগিলাম। খাদ্য খাইতে বিঘ্ন জন্মাইল। এই অবস্থায় একদিন সূর্যোদয়ের আগে, ভোরবেলা গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, ভক্তানন্দ জলের মধ্যে কোমর ডুবাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার নিকটে গেলাম। দেখিলাম, যন্ত্রণায় তাহার মুখ আকুঞ্চিত বিকৃত হইয়াছে। সারা জীবনে অনেক সেবাদাসী ভোগ করিয়া এখন তাহার মূল্য দিতেছে। আমি বলিলাম, বাবাজী, তোমার গঙ্গায় যাইবার সময় হইয়াছে। সে অতি কষ্টে বলিল, যাইতে পারিতেছি কোথায় ? মুহূর্তেই আমার মনে কী উদয় হইল, নিজেই জানিতে পারিলাম না। ঘাটে নামিয়া তাহাকে গভীর জলে ঠেলিয়া দিলাম। কাশিমবাজারের সাহেবকে জলে ডুবাইয়া মারার আগেও, আমার এমন বিদ্যুচ্চমকিত ইচ্ছা জাগিয়াছিল, অথচ কেন সেই ইচ্ছা হইয়াছিল নিজেও জানিতাম না। কাছে-পিঠে কেহ নাই। ভক্তানন্দ আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া হাত তুলিয়া আমাকে ধরিতে প্রয়াস পাইল। আমি ধরা না দিয়া তাহার পা ধরিয়া আরও গভীর জলে লইয়া গেলাম। সে ডুবিয়া গেল। ভাসিবার একবার চেষ্টা করিল মাত্র, পারিল না। অতলে ডুবিয়া গেল। আমি ডুব দিয়া স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া আসিলাম।

'তারপরেও কয়েকদিন আখড়ায় ছিলাম। ভক্তানন্দকে সকলেই অনেক সন্ধান করিয়াছে, পায় নাই। অবশেষে সকলে অনুমান করিল, মহাত্মাকে গঙ্গাই নিজের কোলে টানিয়া লইয়াছেন। আমার মনে কোন বিকার জন্মে নাই। তবে ভক্তানন্দকে ডুবাইয়া মারিবার সময় একটা ক্রোধ সেই মুহূর্তে জাগিয়াছিল। কিন্তু একটা অস্থিরতা আমাকে উদ্‌বেজিত করিতেছিল। সে অস্থিরতা কিসের, জানি না। আখড়া ত্যাগ করিবার সময় বারে বারেই একবার গ্রামে যাইতে ইচ্ছা হইল। সম্ভবতঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী বিধবাটিকে ভোগ করিয়া, আমার মনে পূর্বস্মৃতি জাগিয়াছিল। ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণার কথা ভাবিয়া মনে অনুশোচনা হইয়াছিল।

সেই কারণেই মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, রাত্রের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া একবার দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল, ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণা কী করিতেছে। সংসারের রূপটি কেমন হইয়াছে। কিন্তু পারিলাম না। তাহারা আমার প্রতি যতই আসক্ত হউক, আমি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে তাহারা ভয় পাইবে। আমি তাহাদের কাছে জীবিত নহি। মৃতও নহি। হয়তো এখনও তাহারা শোকে ভারাক্রান্ত। কিছুকাল পরে আর থাকিবে না। আমি এইরূপ ঘটনা দেখিয়াছি। আমি বর্ধমানের দিকে চলিতে লাগিলাম।'



'টাকাগুলি অদ্যাবধি সব নিঃশেষ হয় নাই। কাটোয়া হইতে বীরভূম, এবং সেখানে হইতে ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর ঘুরিয়া কয়েক মাস পরে আবার বর্ধমানে ফিরিয়া আসিলাম। এখন আমার মনে আত্মবিক্রয়ের বাসনা জাগিয়াছে। নিজেকে কাহারও কাছে দাস হিসাবে বিক্রয় করিবার মনস্থ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত কাটোয়া হইতে সাত ক্রোশ দূরে এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত গৃহের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম। গৃহটি যেন নির্জন, প্রাণহীন পরিত্যক্ত বোধ হইল। বাহিরের দিকে ঠাকুরদালানে কপোতেরা বাসা করিয়াছে।

'বহির্বাটিটি দেখিয়া অনেকটা আমাদের গৃহের ন্যায় মনে হইল। কিন্তু কাছারি ঘর বলিয়া কিছু নাই। আমি বহির্বাটির দীর্ঘ ও উচ্চ পিড়ার দাওয়ায় উঠিয়া, একটি খোলা দরজার সামনে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ বৃহৎ কাষ্ঠাসনে বসিয়া জলচৌকির উপরে ঝুঁকিয়া খাগের কলমে কিছু লিখিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে তসরের বস্ত্র ও একখণ্ড কাপাস বস্ত্রের উত্তরীয়। উপবীত দেখা যাইতেছে। আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কে।

'আমি বলিলাম, মহাশয় আমি বড় দুর্ভাগা, আপনার নিকট আত্মবিক্রয়ার্থে আসিয়াছি। কৃপা করিয়া আমাকে ক্রয় করুন।

'মহাশয় বিস্মিত ভ্রূকুঞ্চিত চোখে আমার আপাদমস্তক দেখিলেন। কলম রাখিয়া আমাকে ঘরের ভিতর ডাকিলেন। আমি কাছে গেলাম। তিনি আমার নামধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমার নাম রমাকান্ত। বাকি সবই ভুলিয়া গিয়াছি। মহাশয়ের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কঠিন তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কীরূপ? কে তোমাকে আমার নিকট ভণ্ডামি করিতে পাঠাইল। আমি করযোড়ে বলিলাম, বিশ্বাস করুন, আমি ভণ্ড নহি। আমাকে কেহ পাঠায় নাই। আমি নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে এইমাত্র এই গ্রামে, প্রথমে আপনার নিকটেই আসিয়াছি। আমি আপনার নাম

জ্ঞাত নহি। আপনার গ্রামবাসী কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি একটি সৎ গৃহস্থকে সন্ধান করিতেছি, যেখানে আত্মবিক্রয় করিয়া, কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিব।

'মহাশয় কাঁধের উত্তরীয়টি নামাইয়া রাখিয়া আবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তোমার বংশ জাতি পরিচয় সবই ভুলিয়া গিয়াছ। ইহা এক প্রকার ভোজবাজী বলিয়া বোধ হইতেছে। এরূপ একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। যাহা হউক, বল এখন কোথা হইতে আসিতেছ। আমি বলিলাম, আপাতত কাটোযা হইতে আসিয়াছি। বংশ জাতি পরিচয় কিছুই স্মরণ নাই। কয়েক বৎসর হইল, আমি এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কোথায় আমার বাড়ি, কী পরিচয়, কিছুই জানি না। কয়েক বৎসর আগে আমি দেখিলাম, গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অনেক ভাবিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার পিতামাতাই বা কে, কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। আমি একজন আত্মবিস্মৃত মানুষ। এমন কি দেখিলাম, কিছু সনাতি মুদ্রা আমার বস্ত্রে বাঁধা রহিয়াছে। কী করিয়াই বা তাহা আসিল, কে দিল, কিছুই জানি না। পথে পথে ঘুরিয়া লোকের গৃহে পথে ঘাটে যখন যেরূপ কাজ মিলিয়াছে, তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন করিয়াছি। আহার বাসস্থানের কোন স্থিরতা নাই। তাই ভাবিলাম, কোন সৎ ভদ্র গৃহস্থের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিব।

'মহাশয় গভীর মনোযোগে, ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে তাকাইয়া আমার সব কথা শুনিলেন, বলিলেন, তোমার ন্যায় আত্মবিস্মৃত ব্যক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা উন্মাদ হয়। আমি বলিলাম, আজ্ঞে আমি উন্মাদ নহি, আপনার যেরূপ ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ভণ্ড হইলে বিতাড়িত করিবেন। মহাশয় হাস্য করিয়া কহিলেন, বিতাড়ন করিয়া আমার কী সুসার হইবে। তুমি অর্থ লইয়া পলায়ন করিবে। আমি বলিলাম, আমি আমার বিক্রয়-মূল্যের অর্থ দাবী করি না, তাহা আপনার কাছেই রক্ষিত থাকিবে। আমার কোন ঋণ নাই, অতএব আমার টাকারও দরকার নাই। প্রয়োজন হইলে আপনার কাছ হইতে দুই চারি পয়সা চাহিয়া লইব। আমি বহুতর স্বার্থপর কঠিন হৃদয় ব্যক্তি দেখিয়াছি, তাহাদের কাছে আহার বাসস্থানের বিনিময়ে বিশেষ অত্যাচারিত হইয়াছি। ভাগ্য ভাল, আত্মবিক্রয় করি নাই।

'মহাশয় নীরবে আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কী রূপে জানিলে, আমিও তোমার উপর অত্যাচার করিব না। আমি বলিলাম, না জানিয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি। আমার নিয়তি আমাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছে। এখন আপনার যাহা বিবেচনা, অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করুন। তিনি আবার নীরবে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পিছনের দরজাটি খুলিয়া গেল। এক শ্যামাঙ্গিনী যুবতী ঘরের মধ্যে আমাকে দেখিয়াই দরজা টানিয়া বন্ধ করিল এবং আড়াল হইতে

ডাকিল, বাবা আপনার আহারের সময় হইয়াছে, ভিতরে আসুন। মহাশয় পিছন ফিরিয়া ডাকিলেন, শিবি একবার ভিতরে এস।

'আমি মহাশয়ের আচরণে বিস্মিত হইলাম। বাহিরের লোকের সামনে তিনি অন্দরবাসিনী স্ত্রীলোককে ডাকিতেছেন। আবার দরজা খুলিয়া গেল। সেই শ্যামাঙ্গিনী যুবতী দরজায় দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গের শাড়িটি লাল পাড়যুক্ত সামান্য কার্পাস সুতার। অলঙ্কার প্রায় কিছুই নাই। নাকে নোলক, হাতে লোহা ও শাঁখা। কানে কড়ি মাকড়ি, গলায় সরু হার। পায়ে মল নাই। মাথায় ঘোমটা টানা, চোখে ভ্রূকুটি বিস্ময়। নাতিদীর্ঘ, স্বাস্থ্যবতী, সধবা রমণীটির চোখ দুইটি আয়ত, উচ্চ নাসা, ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁট। মহাশয় পিছন ফিরিয়া আমার কথা সবিস্তারে যুবতীকে বলিলেন। মহাশয়ের কথা শুনিতে শুনিতে যুবতীর চোখে ও মুখে নানারূপ অভিব্যক্তি ফুটিতে লাগিল। মহাশয় আমার বক্তব্য সবিস্তারে বলিয়া মন্তব্য করিলেন, ইহার কথাবার্তায় শালীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ দেখিতেছি। উন্মাদ বলিয়াও আপাতত বোধ হইতেছে না।

'আমি যুবতীর 'বাবা' সম্বোধনে উভয়কে পিতাপুত্রী জ্ঞান করিলাম। যুবতী বলিল, এই বিষয়ে সকলের সহিত আলোচনা করিয়া, যাহা বিবেচনা হয়, তাহা করিবেন। গ্রামস্থ সকলের সামনে ইহাকে উপস্থিত রাখিয়া কথা বলিবেন। পরে কাটোয়ার কাজী যাহা বলে, তাহাই হইতে পারে।

'মহাশয় আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী কাজ করিতে পারিবে? আমি বলিলাম, দাসকে যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কথাবার্তা শুনিয়া মনে হইতেছে, কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ। চিঠিপত্র লিখিতে পারিবে? আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করিয়া বলিলাম, পারিব। মহাশয় ও তাঁহার কন্যার চোখে বিস্ময় ফুটিল। মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমাকে চন্ডীকা কালিকা পুরাণাদি পাঠ করিয়া শুনাইতে পারিবে। বলিলাম, পারিব। ভৃত্যের কাজ হইতে শুরু করিয়া সকল কাজই পারিব। আমি আত্মবিস্মৃত, এই একমাত্র অভিশাপ লইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি।

'মহাশয় ও কন্যা পরস্পরের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। মহাশয় বলিলেন, আমি সদ্বংশজাত আত্মবিস্মৃত উন্মাদ ব্যক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কখনও দেখি নাই। তুমি কি তোমার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছ।

'বলিলাম, না, আজ্ঞা মহাশয়, আমার কোন বিবেচনা নাই। উহা আপনার বিবেচনাপ্রসূত। যুবতী বলিল, বাবা এখন ইহাকে অপেক্ষা করিতে বলুন। আপনি ভিতরে আহার করিতে চলুন। আপনার বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া, যাহা হয় করিবেন।

'মহাশয় বলিলেন, তাহাই করি। তবে এই দ্বিপ্রহরে ইহাকে কিছু অন্নজল দাও। আমাকে বলিলেন, তুমি এই ঘরে বস। বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, কাষ্ঠাসন হইতে নামিয়া ভিতরে গেলেন। যুবতী একবার আমাকে দেখিয়া পিতাকে অনুসরণ করিল। দরজাটি টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

'বুঝিতে পারিলাম, শিবি নাম্নী যুবতী আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অন্দরে পিতার সহিত আলোচনা করিবে। আমার কোন ভয় নাই। এই গ্রামে পরিচিত কেহ থাকিলেও আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমি ঘরের এক পাশে বসিলাম।

'অপরাহ্ণে কয়েক ব্যক্তি আসিলেন। ইতিমধ্যে আমাকে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পরিচ্ছন্ন কলাপাতায় অন্ন পরিবেশন করিয়াছিল। আমি গৃহস্থের নামটি তাঁহার জলচৌকিতে রাখা কাগজে দেখিয়া লইয়াছি। তাঁহার নাম অম্বিকাভূষণ ভট্টাচার্য, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্র, তর্কতীর্থ। উত্তম তুলট কাগজে দেখিলাম, মঙ্গলাচরণ করিয়া, আত্মপরিচয় লিখিয়া তিনি সর্বমঙ্গলা দেবীর উপাখ্যান সংস্কৃতে রচনা করিতেছেন। মহাশয় আহারের পর সম্ভবতঃ অন্দরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া বহির্বাটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেই বোঝা যায়, ইঁহারা গ্রামের ব্রাহ্মণ প্রধানগণ। সকলেই আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। আমি অতি সতর্কতার সহিত সকলের সকল কথার উত্তর দিলাম।

'নিয়তি অলক্ষ্যে হাস্য করিতেছিল কিনা জানি না, সকলেই আমার কথায় সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইলেন। পরের দিন আমাকে স্বহস্তে আত্মবিক্রয়পত্র লেখান হইল। আমি বাংলায় আত্মবিক্রয়পত্র লিখিলাম। মূল্য একশত টাকা। পলায়ন করিলে, সরকার আমাকে যদৃচ্ছা শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। সেই পত্র লইয়া তর্কতীর্থ মহাশয় সদলবলে আমাকে লইয়া কাটোয়ার কাজীর নিকটে গেলেন। কাজী বিক্রয় কোবালায় সহিসাব্যস্ত করিয়া, কোম্পানীর মুদ্রা ছাপিয়া দিলেন। আমি বিক্রয় হইয়া গেলাম।

'ক্রমে জানিলাম, তর্কতীর্থ মহাশয়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মোটামুটি ভালই আছে। তাঁহার কোন পুত্র নাই। তিন কন্যা, তাহাদের সকলেরই কুলীন বংশে বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয়া কন্যা বিংশবর্ষীয়া শিবানীকে তাহার বৃদ্ধ-স্বামী গৃহে লইয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া বৎসরের জামাইপ্রাপ্তি লইয়া যায়।

'শিবানী প্রথম দিনে আমাকে নিতান্ত কৃষাণ জাতীয় ভাবিয়া সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দ্বিধা করে নাই। পরে আর আমার সামনে বিশেষ আসিত না। তর্কতীর্থ মহাশয় প্রথম দিকে কিছুদিন আমাকে ভৃত্যের কাজ করাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার কী মনে হইয়াছে, গৃহভৃত্যের কাজ হইতে আমাকে নিস্তার দিয়াছেন। আমি লিখিতে পড়িতে পারি, তাহা ভোলেন নাই। তিনি প্রকৃতই আমার কাছে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বসিয়া চন্ডী ও কালিকাপুরাণ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্বমঙ্গলা উপাখ্যান লেখনীর বিষয়ও আমাকে বলিয়াছেন। পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আমার যে সব স্থানে নিতান্তই ত্রুটি মনে হইয়াছে, তাহা সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছি। তিনি চমৎকৃত হইয়া আমাকে সাধুবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই কোন সদ্‌ব্রাহ্মণবংশীয় সন্তান হইব। সর্পদংশনে বা মৃতজ্ঞানে হয় তো আমাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। অন্যথায় এরূপ হইতে পারে না।

'এইভাবে বৎসরাধিক কাটিয়া গেল। বহির্বাটির একটি ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরটি যথাযথ বাসোপযোগী করিয়া, বিছানা আয়না চিরুনি বস্ত্র গামছা সবই দেওয়া হইয়াছিল। একটি দাসী আসিয়া মাঝে মাঝে আমাকে শিবানীর আদেশ জ্ঞাপন করিয়া যাইত, যেন আমি চুলে ও শরীরে তেল জল ঠিকমত ব্যবহার করি। মাথার চুল পূর্বেই কাটান হইয়াছিল। বড় চুল আমি ছোট করিয়া ফেলিয়াছিলাম। দাড়ি কামাই নাই। শিবানীর প্রেরিত দাসী বলিত, দাড়ি রাখিবারই বা প্রয়োজন কী। ছোট দিদিঠাকুরুণ ইহা পছন্দ করেন না। না করিলেও আমার উপায় ছিল না। দাড়ি আমার ছদ্মবেশের কাজ করিত। ক্রমে ক্রমে বহির্বাটি হইতে বহির্বাটির অন্দরের দরদালানে আমাকে খাইতে দেওয়া হইত। অন্তরালে থাকিয়া শিবানী আমাকে লক্ষ্য করিত তাহা জানিতাম। অন্দরমহলে কখনই যাইতাম না। সে অনুমতিও আমার ছিল না। আমার বেশির ভাগ সময় তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গেই কাটিত। কিন্তু শিবানী আমাকে যেন ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য করিত। কখনও দেখিতাম, আমার শয্যার উপরে সযত্নে তৈরি সুদর্শন কাঁথা রহিয়াছে। পুরনো বালিশের পরিবর্তে নতুন বালিশ আসিত। নিতান্ত খুঁইয়া ধুতির পরিবর্তে চিকণ ধুতি ঘরে শোভা পাইত। কিন্তু আমি তাহা ব্যবহার করিতাম না, কারণ কৃষাণ রাখাল ও দাসীভৃত্যবৃন্দ সন্দেহ করিতে পারে।

'মাঝে মাঝে শিবানীর কিশোরী দাসীটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, সত্যই কি তুমি নিজের নামধাম কিছুই জান না! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, সেসব ভোল নাই, কেবল বংশ পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছ। ইহা কী করিয়া হয়। আমি বুঝিতাম, শিবানী অন্তরালে থাকিয়া আমার উত্তর শুনিত। আমি দাসীটিকে বলিতাম, আমি অভিশপ্ত, সেইজন্যই সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মানুষ একবার সাঁতার শিখিলে যেমন ভোলে না, বিদ্যাও সেইরকম ভোলা যায় না। দাসীটি আবার জিজ্ঞাসা করিত, বিবাহ করিয়াছিলে কিনা, মনে করিতে পার। উত্তর দিতাম না।

'ক্রমে তর্কতীর্থ মহাশয় আমার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছিলেন। তিন কন্যার জন্য তিনি কি কি বিষয় সম্পত্তি রাখিয়াছেন, সবই বলিতেন। আমাকে কন্যাদের সম্পত্তি দানপত্রও দেখাইয়াছেন। গঙ্গার পূর্বপারে, নদীয়ার চাকদহের সন্নিকটে ছোট কন্যা শিবানীর জন্য একটি ভদ্রাসন ও কিছু জমি এবং এই বাড়ি দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিবানীর কোন সন্তানাদি হইল না। আর হইবার আশাও নাই। কারণ তাহার স্বামীটি বৃদ্ধ, বীরভূমের অধিবাসী। কাটোয়া হইতে সাত ক্রোশ উত্তরে শিবানীর শ্বশুরালয়।

'এইভাবে দিন যাপনের মধ্যে ক্রমেই আমার মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সাহেব ও ভক্তানন্দ হত্যা আমার মনে পড়িলে একটা অস্থিরতা পাইয়া বসে। স্বগৃহে আর ফিরিয়া যাইবার কোন ব্যাকুলতা বোধ করি না। বর্তমান অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার অর্থ অনুসন্ধান করিতে বসিয়া কোন কূলকিনারা পাই না। অন্তরের মধ্যে সর্বব্যাপী একটা ক্রোধ, অথচ বিমর্ষতার অন্ধকারে সব

কিছু ঢাকা পড়িয়া থাকে। মাঝে মাঝে জীবনকে নিরর্থক বোধ হয়, আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে।

'এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে সহসা একটি ঘটনা ঘটিল। আমার গঙ্গা-যাত্রার পরে দেড় বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পরে কয়েকজন ব্যক্তির আগমন ঘটিল। তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে তাহাদের কী কথা হইল, কিছুই জানি না। শিবানীর কিশোরী দাসীটি আসিয়া আমাকে বাড়ির ভিতর ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি ভিতরে গেলাম। শিবানী অন্দরের দরদালানে দাঁড়াইয়া আমাকে স্পষ্ট স্বরে ডাকিল ভিতরে আসুন, কথা আছে।

'আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঘরের ভিতরে গেলাম। এই প্রথম সে আমাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিল, "আপনি" বলিয়া উচ্চারণ করিল। দেখিলাম, শিবানী বিশেষ উত্তেজিত। সর্বাঙ্গে ঘাম, ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। বলিল, আমার স্বামী মরিয়াছে, শ্বশুরালয় হইতে আমাকে নিতে আসিয়াছে। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি উহারা আমাকে মৃতের সঙ্গে সহমরণে দিবার জন্যই এতকাল পরে নিতে আসিয়াছে। আপনি যে-ই হউন, আমাকে পরামর্শ দিন, আমি কি করিব।

'আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিশ্চুপ রহিলাম। আমি কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। শিবানী অস্থির আবেগে বলিল, শীঘ্র বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। মরিতে যাইব, না বাঁচিব।

'আমার বিস্মিত মনে তাহার কথাগুলি বিঁধিয়া গেল। কবে হইতে সে আমার প্রতি এত নির্ভরশীল হইয়াছে জানি না। নিজের পিতাকে না বলিয়া সে আমার মতামত জানিতে চাহিতেছে। আমার নিজের বাঁচিবার প্রবল ইচ্ছার কথা মনে পড়িল, আর তৎক্ষণাৎ আমার ভিতর হইতে যেন কেহ বলিয়া উঠিল, যে বাঁচিতে চাহে, সে কেন মরিবে। তাহাকে আপন শক্তিতে বাঁচিতে হইবে। আমি বিংশ-বর্ষীয়া শিবানীর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম শাড়ির আঁচলে আবৃত বক্ষযুগল যেন রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হইযা রহিয়াছে, ওঠা নামা করিতেছে না। আয়ত কালো চোখের অপলক দৃষ্টি আমার প্রতি। সেই দৃষ্টিতে অতিশয় উত্তেজনা, ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, সহমরণ যদি আপনার নিকট আত্মহত্যা বলিয়া মনে হয়, তবে কেন বাঁচিবেন না। বাঁচিতে হইলে আপনাকে নিজের শক্তিতে বাঁচিতে হইবে। শিবানীর চোখ জলে ভাসিল, বলিল, আর কিছু জানিতে চাহি না, আপনি আপনার ঘরে যান।

'আমি চলিয়া আসিলাম। আমার মনে এখনও তাহার এই অভূতপূর্ব নির্ভরশীলতা, প্রথম বাক্যালাপ, দাসকে আপনি সম্বোধন, তোলপাড় করিতে লাগিল। তর্কতীর্থ মহাশয় অতি ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবি শিবি বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শিবানীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমি বহির্বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া দেখিলাম, শিবানীর শ্বশুরালয় হইতে চারি বেহারার পাল্কি লইয়া দুই ব্যক্তি আসিয়াছে। আশেপাশের গৃহস্থ ব্যক্তিরা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছে। কিন্তু শিবানীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শ্বশুরালয়ের

লোকেরা বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকিয়া দেখিতে চাহিল। তর্কতীর্থ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শিবানীর কোন সন্ধান মিলিল না। তাহারা তর্কতীর্থ মহাশয়কে যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। তর্কতীর্থ মহাশয়ও স্পষ্ট বলিলেন, আমার কন্যা বিধবা থাকিবে, তাহাতে তোমাদের আপত্তি কিসের। সে যদি আত্মগোপন করিয়া থাকে, দোষ দিতে পারি না। মৃত স্বামীর সহগামিনী হইতে না চাহিলে বলপ্রয়োগ করা যায় না। গ্রামের কেহ কেহ তাঁহাকে সমর্থন করিল। কেহ কেহ তূষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করিল। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানকর কথা শুনাইল। এমন কি, তাহারা শিবানীর শ্বশুরালয়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে চারিদিকে শিবানীর সন্ধান করিয়া ফিরিল। গৃহের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। আমাকে ও অপরাপর দাসী ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করিল। ক্ষুব্ধ নিরাশায় মন্তব্য করিল, তর্কতীর্থের অসতী কন্যাটি নিশ্চয়ই কাশিমবাজারের ইংরাজদের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে, অন্যথায় কোন বৈষ্ণব আখড়ায় আত্মগোপন করিয়াছে। শুনিয়া আমার মনে বীতরাগ জন্মাইল। ইংরাজ বা বৈষ্ণব আখড়ার আশ্রয়, কোনটাই আমি অন্তর হইতে মানিয়া লইতে পারিলাম না। আবার ইহাও সত্য, এই সব হত্যাকারীদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার আর কোন পথ নাই। অথচ দেশে কি হিন্দু বিধবারা বাঁচিয়া নাই? অনেক বাঁচিয়া আছে। কিন্তু যাহাকে বলপ্রয়োগে মৃত স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় পোড়াইয়া মারিবার সিদ্ধান্ত হয়, সেখানে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। আমি যুগপৎ উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা বোধ করিতে লাগিলাম। শিবানীর শ্বশুরালয়ের লোকেরা সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পালকিসহ চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিস্তর অপমানকর কথা বলিয়া গেল।

'কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসা সত্ত্বেও শিবানীকে দেখা গেল না। তর্ক-তীর্থ মহাশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আমিও উদ্বেগবোধ করিতেছিলাম। এক সময়ে কিশোরী দাসীটি আমাকে অন্তরালে ডাকিয়া জানাইল, ছোট দিদিঠাকুরুণ যথা-স্থানে আছে, কিছু ভাবিও না। আমি সেই কথা তর্কতীর্থ মহাশকে জানাইলাম। তিনি উৎকণ্ঠিত আবেগে তৎক্ষণাৎ কন্যাকে দর্শন করিতে চাহিলেন। শিবানী অদৃশ্য হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পিতার পায়ে পড়িল। তর্কতীর্থ মহাশয় শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। শিবানীও কাঁদিতে লাগিল। সে পিতার পায়ে মুখ রাখিয়া আর্তস্বরে বলিল, বাবা আমার বাঁচিয়া থাকিবার সাধ রহিয়াছে। আমার এই পলায়নের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। তর্কতীর্থ মহশয়ও কাঁদিয়া বলিলেন, তুমি আমার কনিষ্ঠ সন্তান। নিজে বাঁচিয়া থাকিয়া আমিই বা কোন্ প্রাণে তোমাকে বৃদ্ধের চিতায় তুলিয়া দিয়া এই বয়সে বাঁচিয়া থাকিব। তোমার স্বামী ধনী ভূস্বামী ছিলেন। সম্ভবতঃ বাঁচিয়া থাকিয়া তুমি সম্পত্তির দাবী করিবে। এই আশঙ্কায় উহারা তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। আমি সদ্-ব্রাহ্মণ, তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। পিতা-পুত্রীর এই দৃশ্য দেখিয়া বহুকাল পরে আমার চোখও আর্দ্র হইয়া উঠিল। আমি সরিয়া গেলাম।'



'ইহার পরবর্তী ঘটনাবলীকে সমাজ সংসারের মানুষ নিশ্চয় কলঙ্কিত জ্ঞান করিয়া ধিক্কার দিবে। আমি দিব না। কলঙ্ক ও ধিক্কার দেওয়া অতি সহজ। যথার্থ অবস্থায় না পড়িলে, মানুষের চৈতন্য হয় না। দেখিলাম, শিবানী ক্রমেই আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল। ইহাও নিয়তিরই এক বিষম ক্রীড়া। আমি শিবানীকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিলাম না। অথচ আমার মনে গভীর দ্বিধা ও সংশয়। যাহা ক্রমেই অনিবার্য হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার চিত্তে সুখ শান্তি উৎপাদন করিল না। সংসারে নিজেকে বহিরাগত ভাবিয়া, সমস্ত সংস্কারই ত্যাগ করিয়াছি। অতীতের মঙ্গলামঙ্গল বোধ নাই। তথাপি কেন এই দ্বিধা ও সংশয়।

'শিবানীকে কেহই অপরূপ সুন্দরী বলিবে না। কিন্তু সে কুৎসিত নহে। অনতি-দীর্ঘ, স্বাস্থ্যপুষ্ট শিবানী দেখিতে সুশ্রী। কুড়িতে বুড়ি বলে, কিন্তু তাহার যৌবন যেন উপছাইয়া পড়িতেছে। সেই যৌবন আমাকে যতখানি আকর্ষণ করে, তদপেক্ষা তাহার অন্তরের শক্তিই অধিক আকর্ষণীয়। সে এমন অনায়াসে তাহাকে আমার কাছে নিবেদন করিল, আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। তথাপি তাহাকে আমি স্মরণ করাইতে ভুলি নাই, আমি তাহাদের দাস, একজন অজ্ঞাতকুলশীল। শিবানী স্পষ্টই বলিয়াছে, আপনি কী রূপে দাস, তাহা আমি অনেকদিন আগেই বুঝিয়াছি। অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়াও আপনাকে মনে করি না। আপনি আত্ম-বিস্মৃত মানুষ। কিন্তু আপনার আচার আচরণ শিক্ষা দীক্ষা প্রমাণ করিতেছে, আপনি কখনও দাস নহেন। বাবা বলিয়াছেন, আপনি উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহার সর্বমঙ্গলা কাব্য সংশোধনের ক্ষমতা রাখেন। আমি গোপনে অনেকদিন আপনার চণ্ডী ও কালিকাপুরাণ পাঠ শুনিয়াছি, আর অবাক হইয়া ভাবিয়াছি, আপনি নিশ্চয় শাপগ্রস্ত দেবতা।

'আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছি, শাপগ্রস্ত কি না জানি না। আমি ঈশ্বরেও বিশ্বাস করি না। দেবতা সম্পর্কেও বিশ্বাস নাই। মনে করি, প্রকৃতির মধ্যে নিয়তি আত্মগোপন করিয়া আমাদের সকল বাস্তববোধ ও বিশ্বাসকে ভাঙিয়া চুরিয়া, তাহার ইচ্ছামত চালিত করিতেছে। অন্যথায় আমিই বা কেন এমন আত্মবিস্মৃত হইব। অতঃপরেও এই অবিশ্বাসীর কাছে তুমি কি নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিবে!

'শিবানী নির্দ্বিধায় বলিয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আপনার চিন্তার সঙ্গে আমার কোন প্রভেদ দেখিতেছি না। বাল্যে তো কত স্বপ্নই এই জীবনকে লইয়া দেখিয়াছি। সমস্তই মিথ্যা হইয়াছে। তবে তাহার জন্য আমি ঈশ্বরকে দোষ দিব না। ঈশ্বর

আছেন, তিনিই আমার ভাগ্য চালিত করিতেছেন। ঈশ্বর না থাকিলে, আপনাকেই বা কেমন করিয়া পাইতাম। ইহাকে আমি মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর যদি ইহাতে রোষ করেন, তাহা মাথা পাতিয়া লইব। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।

'আমার চোখের সামনে ইন্দুমতী ও লক্ষ্মণার মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছিল। হারাই-তেও বিলম্ব হয় নাই। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, শিবানীর প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তর্কতীর্থ মহাশয় দুই মাসের মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। সম্ভবতঃ তিনি আমার প্রতি কন্যার আচরণ দেখিয়া মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। আমাকে প্রায়ই রোগশয্যায় ডাকিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, তোমাকে আমি দাস রূপে দেখি না। তুমি বিদ্বান বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। বিপদে আপদে আমার কন্যাটিকে রক্ষা করিও।

'আমি ভাবিতাম, ঠোঁটের কোণে হাসিয়া নিয়তি আবার কোন্ দৈবের দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। নিয়তির সঙ্গে আমার মীমাংসা হইবে না। হইবার নহে, অতএব ভবিষ্যৎ জীবন-জিজ্ঞাসা আমার মধ্যে নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে। যে-জীবন আমার নহে, তাহার মধ্যেই সে আমাকে ঠেলিয়া দিতেছে। এমন ক্রীড়নকের জীবন কীরূপেই বা অতিবাহিত করিব।

'তিন মাসের মধ্যে তর্কতীর্থ মহাশয় গত হইলেন। খবর পাইয়া শিবানীর দিদিরা ও ভগ্নিপতিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদের নিকট দাসের মত ব্যবহার করিলাম। গৃহের অন্যান্য দাসীভৃত্যের সামনেও, যথাসাধ্য দাসের মত আচরণ করিতাম। ব্যতিক্রম ছিল, শিবানীর বাগদি বালিকা দাসীটি। সে বিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা, শিবানীর সখীর ন্যায়। তর্কতীর্থ মহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি হইল। গ্রামের ব্রাহ্মণ প্রধানদের ডাকিয়া, নিজ নিজ পিতৃসম্পত্তি বুঝিয়া লইল। তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার দানপত্রে পূর্বেই তিন কন্যার প্রাপ্তি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব, কোনপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা বিদায় লইলে, শিবানীর আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত হইল। সে গর্ভবতী হইল। গ্রামে বাস করা আর সম্ভব ছিল না।

'তর্কতীর্থ মহাশয়ের শুভানুধ্যায়ী যাঁহারা ছিলেন, শিবানী তাঁহাদের ডাকিয়া জানাইল এই গ্রামের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবে। তাহার প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি, নদীয়ার ভদ্রাসনে গিয়া বাস করিবে। তাঁহারা সম্মতি দিলেন। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। আমি ক্রীতদাস, অতএব ত্যাগের প্রশ্ন নাই। কেবল বাগদি দাসীটিকে সে সঙ্গে লইল।'



'শিবানী বুদ্ধিমতী, দূরদৃষ্টিসম্পন্না, তেজস্বিনী। নিতান্ত ভোগ বাসনায় সে আমাকে আশ্রয় করে নাই। সে বাঁচিতে চাহিয়াছে, এবং পূর্ণ রমণী হইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছে। সে স্বেচ্ছাচারিণী নহে, কিন্তু সকল শাস্ত্রের ঊর্ধে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমি তো প্রতিষ্ঠা চাহি নাই। আমি কদাপি আমার পরিচয় তাহাকে দিই নাই। আমাকে আত্মবিস্মৃত জানিয়াই সে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। সে আমাকে তাহার স্বামীর পরিচয় দিয়াছে, এবং পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

'দেখিলাম সে বিধবা হইয়াও আমার সংসর্গ করিল। পুত্র জন্ম দিল। পূর্ণ সংসার পরিচালনা করিতে লাগিল। সে বলিল, আমি স্বৈরিণী নহি। তুমিই আমার স্বামী এবং প্রথম ও শেষ পুরুষ। দয়া করিয়া আমাকে স্বৈরিণী ভাবিও না।

'শিবানীর প্রতি আমার কোন অবিশ্বাস ছিল না। কিন্তু নিয়তি নির্দেশের ক্রোধ আর আমার মধ্যে নাই। নিয়তি পরাস্ত হইল, কি আমি পরাস্ত হইলাম, জানি না। ঘৃণা আমার মনকে বিষাক্ত করিতেছে না। ক্রমে সমগ্র জীবনের মধ্যে আমার একটি উপলব্ধি জন্মিল, জন্মসূত্রেই মানুষ অসহায়। সে তাহার জীবনের নিয়ামক হইতে পারে না, জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে সে একান্ত পরাধীন। এই পরাধীনতার বোধ সমস্ত মানুষকে নিরন্তর অস্থির করিতেছে, নানারূপে দংশন করিতেছে এবং সে গভীর জ্বালায় এই পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির উপায় খুঁজিতেছে। এই মুক্তির ক্রন্দনও জন্মমাত্র সূতিকাগারে নবজাতকের প্রথম কান্নায় ধ্বনিত হইয়া ওঠে।

'এই পরাধীনতা আত্মিক, মুক্তির জন্য সংগ্রামও আত্মিক। এই মুক্তির সন্ধানই মানুষের চিরকালীন প্রবৃত্তি। ইহা মানবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু শিবানীর সঙ্গে সুখের গৃহবাসে, এই আত্মিক মুক্তির পথের সন্ধান পাইব না। তাহাকে আমি স্পষ্ট বলিলাম, আমি বিদায় চাই, তুমি বাধা দিও না।

'শিবানী কাঁদিল, কিন্তু আমাকে বাধা দিল না। কেবল বলিল, তুমি কে, তাহা একপ্রকার জানিয়াছি, প্রকৃত জানি না। তুমি কিসের অন্বেষণে ফিরিতেছ, তাহাও আমার বোধগম্য নহে। আমি চিরদিন তোমার পথ চাহিয়া থাকিব, তোমার সন্তানকে তোমার মত মানুষ করিবার চেষ্টা করিব। ইচ্ছা হইলে ফিরিয়া আসিও।

'শিবানী একান্ত মানবী, তাহার শক্তিতে আমার গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রহিয়াছে। তাহাকে বলিলাম, যাইবার আগে আমি আমার জীবনবৃত্তান্ত কিছু লিখিয়া যাইব...'



তাপস অতি মগ্নাবস্থায়ও সহসা চমকে উঠলো। ওর সামনে মোমবা
জ্বলছে। এখনও পাণ্ডুলিপির শেষ কয়েকটি পংক্তি অনুবাদ বাকি রয়েছে
কিন্তু সহসা একটা আলোর ঝিলিক গঙ্গার জলে দেখতে পেলো। সেই আলো
ঝিলিক ঘরের পাল্লাবিহীন দরজার গায়ে পড়লো। কাদায় পায়ের শব্দ ও স্খলি
অস্পষ্ট গলার স্বর হঠাৎ শোনা গেল। কাদায় পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে

কে, বা কারা আসতে পারে? পুলিশ? অলক কল্যাণরা? তাপসের চোখে
সামনে পয়েন্ট থ্রি এইট ভেসে উঠলো। ও দ্রুত কাগজপত্র ব্যাগের মধ্যে ভরে নি
ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। কাদার ওপর পায়ের শব্দ আরও কাছে এগি
আসছে। টর্চের আলোর ঝিলিক আবার দরজার কাছে ছোবল দিয়ে গেল।

তাপস মুহূর্তেই ব্যাগের মধ্যে সমস্ত কিছু ঢুকিয়ে নিয়ে, ব্যাগ হাতে
দাঁড়ালো। পার্টি বা পুলিশ, দুই-ই তার কাছে এখন নিয়তির রূপ নিয়ে এ
দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পার্টির বর্তমান নীতি ও পুলিশের কাছে ও আত্মসমপ
করতে পারবে না। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য ওকে বেঁচে থাকতে হবে। ও দরজা
দিকে এগিয়ে গেল। গঙ্গার ভাঙ্গা ঘাটের দিকে মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দি
এগোতে লাগলো।

পায়ের শব্দ গঙ্গাযাত্রীর ঘরের কাছে এগিয়ে আসছে। টর্চের আলোর ঝিলি
সাপের ছোবলের মত ইতস্ততঃ ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাপস অকুরের ঘুমভা
ঘড়ঘড়ে স্বর শুনতে পেল, 'কে?'

তাপস ভাঁটা পড়া গঙ্গার নিচে নেমে, মাথা নিচু করে দ্রুত এগিয়ে গেল
পিছনে নানা স্বর ও পায়ের শব্দ ভেসে আসছে।